মে ১৯৯৩

মাসিক

জাগো মুজাহিদ

MONTHLY JAGO MUJAHID

বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারী পাপিষ্ঠরা
অন্ধ হয়ে যাচ্ছে

ফিলিস্তিনে হামাসের উত্থান ঃ
ইসরাইল থরথর কাঁপছে

মধ্য এশিয়ার মর্দেমুজাহিদ
ইমাম শামিল

মাসিক

জাগো মুজাহিদ

· MONTHLY JAGO MUJAHID

প্রতিষ্ঠাতাঃ
শহীদ কমাণ্ডার আব্দুর রহমান ফারূকী (রাহঃ)

দ্বিতীয় বর্ষ ৬ষ্ট সংখ্যা
১৮ বৈশাখ-১৪০০
৯ জিলক্বদ-১৪১৩
১ মে -১৯৯৩

পৃষ্ঠপোষকঃ
কমাণ্ডার মনজুর হাসান

সম্পাদকীয় উপদেষ্টাঃ
উবায়দুর রহমান খান নদভী

সম্পাদকঃ
মুফ্‌তী আব্দুল হাই

নির্বাহী সম্পাদকঃ
মনযূর আহমাদ

সহসম্পাদকঃ
হাবিবুর রহমান খান
মুফ্‌তী শফিকুর রহমান

মূল্য ঃ ৭ (সাত) টাকা মাত্র

যোগাযোগঃ
সম্পাদক জাগো মুজাহিদ
বি/৪৩৯, তালতলা,
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।
ফোনঃ ৪১৮০৩৯

অথবা

জি, পি, ও বক্স নম্বরঃ ৩৭৭৩
ঢাকা-১০০০

সূচী পত্র

* পাঠকের কলাম ২
* সম্পাদকীয় ৫
* আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ
আমীনুল ইসলাম ইস্‌মতী ৭
* বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারী পাপিষ্ট করসেবকরা অন্ধ হয়ে যাচ্ছে ১১
* ফিলিস্তিনে হামাসের উত্থানঃ ইসরাইল থরথর কাঁপছে
মুহাম্মাদ শেখ ফরিদ ১৩
* আমার দেশের চালচিত্র
মুহাম্মাদ ফারূক হুসাইন খান ১৫
X কমাণ্ডার আমজাদ বেলাল
আল্লাহ্‌র সাহায্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি ১৯
* আমরা যাদের উত্তরসূরী
একজন পর্যটকের দৃষ্টিতে ইমাম শামিল (রাহঃ)
অধ্যাপক এস, আকবর আহমেদ ২২
X ধারাবাহিক উপন্যাস
মরণজয়ী মুজাহিদ
মল্লিক আহমাদ সরওয়ার ২৭
* কবিতা ২৯
* প্রশ্নোত্তর ৩০
* নবীন মুজাহিদদের পাতা ৩৫
* আপনার চিঠির জবাব ৩৭
* বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের তৎপরতা ৩৮

পাঠকের কলাম

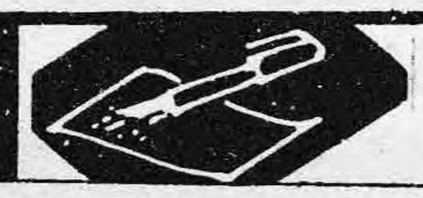

সম্পাদক সমীপেষু।

পত্রিকাটি আরও সমৃদ্ধশালী করার জন্য কয়েকটি সুপারিশ।

১। অস্ত্রের ছবিসহ চাররঙ্গা প্রচ্ছদ।

২। প্রশ্নোত্তর বিভাগটি আরও বর্দ্ধিত করণ

৩। দৈনদিনআচার–আচরণ,খাওয়া–দাওয়া ও শোয়া–বসার শরীয়ত নির্দেশিত পথ–পদ্ধিতির আলোচনা।

৪। রুহানী এলাজ বিষয়ক লেখা।

৫। খেলা–ধুলা ও মাঠ পরিচর্যা শিক্ষা।

৬। প্রত্যেক সংখ্যায় কোন একজন তাবেঈন–তাবেতাবেঈন ও মহামনীষির জীবনী পরিবেশন।

৭। দেশ–বিদেশের খবর।

৮। শালীন কৌতুক।

৯। "আপনার চিঠির জবাব" পাতাটি নিয়মিত জারী রাখা।

আমার এই সুপারিশগুলো সুবিবেচনার অনুরোধরইল।

হাঃ মোঃ জাকির হোসেন খান,
মোড়হাট দর্গাবাড়ী মাদ্রাসা,
পোঃ সালথা বাজার, নগরকান্দা, ফরিদপুর।

ময়দানে নামুন

মাসিক জাগো মুজাহিদদের ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যার জনাব ফারুক হোসাইন খান সাহেবের রচিত "আমার দেশের চালচিত্র" প্রবন্ধটি পাঠ করে যারপর নেই অনুপ্রাণিত ও আশাবাদী হয়েছি। এ ধরণের তথ্যপূর্ণ ও পথ নির্দেশক রচনা প্রবন্ধ আপনারা "জাগো মুজাহিদে" প্রকাশ করে সমাজের যে অপরিসীম খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন এর জন্য সমাজ আপনাদের নিকট চির দিন ঋণী থাকবে। এদেশের কোটি কোটি মানুষ ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণে নিবেদেত প্রাণ কর্মী হতে ইচ্ছুক। তারা মুসলিম জাগরণ ও উজ্জল ভবিষ্যৎ নির্মাণের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। যোগ্য নেতৃত্ব ও মজবুত সংগঠনের অভাবে তারা কর্মে ঝাঁপ দেয়ার সাহস পাচ্ছে না। তাই আমি "জাগো মুজাহিদের" সকল পাঠক বৃন্দের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি যে, যদি আপনাদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি এতটুকু দরদও থাকে এবং এদেশে ইসলামী আইন ও আদালত কায়িম করতে চান, তবে আর ঘরে বসে থাকলে চলবে না। এখনই মাঠে ঝাপিয়ে পড়ুন। একজন মুসলমান হিসাবে আমি আশা করি যে, আপনারা কমপক্ষে প্রত্যেকটি উপজেলা থেকে একজন যোগ্য আলিম যিনি নিয়মিত জাগো মুজাহিদ পাঠে অভ্যস্থ তার নেতৃত্বে উপজেলা ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তুলুন। প্রত্যেকটি ইউনিয়নে এর শাখা–প্রশাখা বিস্তার করে যোগ্য কর্মী তৈরীর চেষ্টা করুন। এভাবে "জাগো মুজাহিদ"কে কেন্দ্র করে দেশ ব্যাপী একটি মজবুত সংগঠন তৈরী করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। যার কেন্দ্র হবে "মাসিক জাগো মুজহিদ" কার্যালয়। এর শাখা–প্রশাখা হবে বিশ্বের কোনায় কোনায়। এই সংগঠনের মুল লক্ষ্য হবে কর্মী তৈরীকরা। আমার ধারণা, প্রত্যেক উপজেলায় "মাসিক জাগো মুজাহিদ" পাঠক রয়েছে। সুতরাং "জাগো মুজাহিদ"কে কেন্দ্র করে দেশ–তথা বিশ্ব ব্যাপী সংগঠন গড়ে তোলা খুবই সহজ। এভাবে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। "জাগো মুজাহিদ" কর্তৃপক্ষকেই এর নেতৃত্বের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এব্যাপারে আগামীতে পাঠক বৃন্দের মতামত জানতে পারব বলে আশা করি।

আহমদ নূরুল্লাহ
দরজায়ে ফযিলত ফিল হাদিছ
জামেয়া হুছাইনিয়া গহরপুর, সিলেট।

দুঃখজনক বই কি!

ইসলামের বিজয় এবং প্রচার হয়েছে একদল ইসলামে নিবেদিত প্রাণ মুসলিম মনীষীর মাধ্যমে। একসময় ব্রাহ্মণদের দুর্দণ্ড প্রভাব প্রতিপত্তি চলত সারা নেত্রকোনায়। আর সে নির্যাতনের এক মাত্র শিকার হত এখানকার নিরীহ মুসরমানেরা। এমনকি সারা নেত্রকোনায় একটি মসজিদ ছিলনা এবং মসজিদ গড়ার মত সুযোগও ব্রাহ্মণরা দিত না। এমনি এক চরম দুর্দিনে মাওঃ আলীমুদ্দীন আহমদ সাহেব নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম ও শত কোরবানীর বিনিময়ে আশ্চার্য এক ইতিহাসের মধ্যদিয়ে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র সৌজন্যে একটু জায়গা সংগ্রহ করে বর্তমান নেত্রাকোনার বড় মসজিদটির ভিত্তি স্থাপন করেন। এর সাথে সাথে মুসলমান ছেলে মেয়েদের মধ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার মানসে মসজিদ ভিত্তিক মকতব শিক্ষা চালু করেন। পরবর্তীতে সেটাকে মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করে নাম দেয়া হয় 'আঞ্জুমান মিডিল স্কুল মাদ্রাসা'। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, নেত্রকানা শহরের মুসলমান ছেলেমেয়েরা ইংরেজী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকছে তখন স্কুলটিকে আরো সংস্কার এবং নতুন সিলেবাস চালু করার চিন্তাভাবনা চলে। এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তীব্র প্রয়োজন অনুভব করে নেত্রকোনা মিউনিসিপ্যালিটি পরিষদ কর্তৃক রেজুলেশন মূলে দেয়া জায়গায় পূর্বের মাদ্রাসাটি স্থানান্তর করা হয়। যার বর্তমান রূপ এই 'আঞ্জুমান সরকারী আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়।'

এটা এমন এক বাস্তব সত্য ইতিহাস যা নেত্রকোনার সকলেই জানে। এ কথাটি আঞ্জুমান স্কুলের সাহিত্য সাময়িকী (১৯৯০–৯১) 'পল্লব'–এও উল্লেখিত হয়েছে। আমরা 'পল্লবের' সে অংশটুকু তুলে ধরছিঃ "১৯১৪ সালের কথা। সে সময় জনাব এলাহী নেওয়াজ খান ছিলেন নেত্রকোনা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান। ঢাকার বিখ্যাত নওয়াব পরিবারের অবদান নেত্রকোনা জামে মসজিদ সংলগ্ন বর্তমানে

নওয়াব বোর্ডি নামে পরিচিত স্থানে তখন চালু ছিল আঞ্জুমান মিডিল স্কুল মাদ্রাসা। ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হত এই মাদ্রাসা স্কুলটিতে। আঞ্জুমানে ইসলামিয়া নামে একটি কমিটি দ্বারা পরিচালিত ছিল এই মাদ্রাসা। নেত্রকোনা জামে মসজিদের ইমাম, তৎকালীন বিখ্যাত আলেম মৌলানা আলীমুদ্দিন আহমদ ছিলেন এই মাদ্রাসা স্কুলের প্রধান। কিন্তু মিডিল স্কুল মাদ্রাসা পাশ করে বেরিয়ে আসা মুসলিম ছাত্ররা উচ্চ ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্যি হতে বিমুখ হওয়ায় উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হতে চললো।

এমনি এক সংকট কালে মরহুম এলাহী নেওয়াজ খান বি, এল, সাহেব নেত্রকোনা মিউনিসিপ্যালিটির এক রেজুলেশন মূলে আঞ্জুমান স্কুলের বর্তমান জমিটুকু বার্ষিক একটাকা জমার বিনিময়ে বন্দোবস্ত দিয়ে উক্ত আঞ্জুমান মিডিল স্কুল মাদ্রাসাকে স্থানান্তরিত করে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় রূপে চালু করার প্রচেষ্টায় ব্রতী হন।"

সুতরাং মাওঃ আলীমুদ্দিন আহমদ সাহেবের মত স্বনামধন্য ব্যক্তির গৌরবপূর্ণ কৃতিত্বকে হেয় করার যে ষড়যন্ত্র ইদানিং চলছে যা দুঃখজনক বৈ কি!

মাওলানা ফজলুর রহামন,
সহকারী অধ্যাপক,
এন, আকন্দ আলীয়া মাদ্রাসা,
নেত্রকোনা।

প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়েছি

আমি জাগো মুজাহিদের একজন নতুন পাঠক। গত নভেম্বর সংখ্যা পড়েই জাগো মুজাহিরেদ প্রেমে পড়ে যাই। গত সংখ্যার প্রত্যেকটি কলামই আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছে। তাই সকল লেখককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জাগো মুজাহিদের একটি কপি পড়ে যে উপকার পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। জাগো মুজাহিদ নামটি শুনিতেই আমাদের মনে আনন্দ জাগে। আমার বিশ্বাস, জাগো মুজাহিদ আমার মত লক্ষ তরুণকে জেহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে সফল হবে। আর এমন পত্রিকা দরকারই আমার মত যৌবন উচ্ছল তরুণদের। দুঃখের বিষয়, আজ কত যে তরুণ-তরুণী বিজাতীয়দের অনুসরণে বিপথগামী হচ্ছে তার কোন ইয়াত্তা নেই। আমরা যদি সবাই কম পক্ষে একজন করে নতুন পাঠক পাঠিকা তৈরী করি তাহলে বিপর্যয়গামী তরুন-তরুণীর সংখ্যা হ্রাস পাবে নিশ্চয়ই। পরিশেষে জাগো মুজাহিদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ ও অভিনন্দন এবং কামনা করি এর বহুল প্রচার প্রসার।

মোঃ ওয়াদুদ খান (রেনু)
গ্রামঃ দক্ষিণ ভাদিকারা,
থানাঃ কালাউক, জেলাঃ হবিগঞ্জ।

হাঁপানি বাত প্যারালাইসিস চর্মরোগ এ্যালার্জি

- গ্যাস্টিক, আলচার, গলা ও বুকজ্বালা, লিভারদোষ, রক্ত আমাশয়, পুরাতন আমের দোষ।
- প্রস্রাবে ক্ষয়, ঘনঘন প্রস্রাব, (ডায়াবেটিস), প্রস্রাবের জ্বালা পোড়া, কিটকিট কামড় মারা
- স্বপ্ন দোষ, শ্রক্র তারল্য, পুরুষত্বহীনতা, লিঙ্গে দোষ।
- সিফিলিস, গনোরিয়া, প্রস্রাবের রাস্তা দিয়া রক্ত পুঁজ যাওয়া, ধ্বজভঙ্গ।

স্ত্রী ব্যাধি

- শ্বেত পদর (লিকুরিয়া), রক্ত প্রদ, বাধক বেদনা, যে কোন কারণে মাসিক বন্ধ, সুতিকা, শুকনা সুতি, নারিত্বহীনতা, ১০/১৫ বৎসর বিবাহ হয়েছে আজও সন্তান হয় নাই তাদের সন্তান লাভ।
- অর্শ, গেজ, ভগন্দর, শ্বেতী, সুলী, ব্রন, মেন্ডা, কানপাঁকা, কানে কম শোনা, চক্ষুরোগ, মস্তিষ্কের দুর্বলতা, মৃগী, পাগল, অকাল চুল পাকা ও উঠা ইত্যাদিতে নিশ্চয়তা।

উপরে বর্ণিত রোগে যারা আক্রান্ত তাদের সেবা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রথম শ্রেণীর হাকিম হাফেজ মেছবাহ উদ্দিনের সহিত নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগঃ
হাকিম হাফেজ মেছবাহ উদ্দিন

গওহার ইউনানী ঔষধালয়

সেকশন-১২, ব্লক ডি (পানির ট্যাংকি সংলগ্ন)
মিরপুর, ঢাকা-১২১২২

'জাগো মুজাহিদ'=এর নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✪ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✪ এজেন্সীর জন্য অগ্রীম বা জামানত পাঠাতে হয় না।
- ✪ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ভিপিতে পাঠানো হয়।
- ✪ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✪ অবিক্রিত কপি ফেরৎ নেয়া হয় না।
- ✪ ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

২. বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিষ্ট্রি ডাক)

✪ বাংলাদেশ	একশো চল্লিশ টাকা
✪ ভারত ও নেপাল	ছয় ডলার
✪ পাকিস্তান	আট ডলার
✪ মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা	পনের ডলার
✪ মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	পনের ডলার
✪ ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া	আঠার ডলার

সাধারণ ডাকে গ্রাহক করা হয় না।

৩. গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার নিয়ম

- ✪ গ্রাহক হবার জন্য ব্যাংক ড্রাফট ও চেক 'মাসিক জাগো মুজাহিদ' নামে পাঠাতে হয়। দেশের অভ্যন্তর থেকে মানি অর্ডার পাঠাতে হবে নিম্নের যোগাযোগের ঠিকানায়।

সব রকম যোগাযোগের ঠিকানা

মাসিক জাগো মুজাহিদ
বি-৪৩৯; তালতলা,
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

সম্পাদকীয়

নব্য ফেরাউনদের রুখতেই হবে

পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন বিশ্ব রাজনীতিতে মারাত্মক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করেছে। এতদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকা এই দুই পরাশক্তি বিশ্বে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার, পণ্য বাজার দখল, মারণাস্ত্র উৎপাদন প্রতিযোগিতা, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সামরিক ঘাটি নির্মাণ, মহাকাশে ম্যারাথন দৌড় প্রভৃতি ইস্যু নিয়ে দাপাদাপি গুতোগুতির আসর বেশ জমিয়েছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতার মাঝ থেকে সোভিয়েত ইউনয়নের ছিটকে পরার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একতরফাভাবে জিতে গেল।

বিজয়ের পর জর্জ বুশ সাহেব ভেবে বসলেন যে, বিশ্ব এখন আমার মুঠোয়! আমিই এখন বিশ্বের একচ্ছত্র মোড়ল। উত্তর–দক্ষিণ, পূর্ব–পশ্চিমের সাবইকে এখন আমার কথায় ওঠ বস করতে হবে। অর্থাৎ তিনি ফেরাউনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাতারাতি বিশ্বের অঘোষিত খোদা বনে গেলেন!

কিন্তু বিনা যুদ্ধে এত বড় প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করেও বুশ সাহেব সুখে নিদ্রা যেতে পারলেন না। জাকার্তা থেকে ডাকার পর্যন্ত কতগুলি মানুষ আল্লাহ্ এর নাম জপ করছে! রাসূলের (সাঃ) আদর্শ আঁকড়ে ধরে আছে! ওরা জাগছে! সেকুলারিজম, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের ছড়া শুনিয়ে ওদের আর ঘুম পাড়িয়ে রাখা যাচ্ছে না। অদ্ভুত ওদের চরিত্র। অতীতের ন্যায় যে কোন সময় ওরা অঘটন ঘটিয়ে বসেত পারে! বীর পুরুষ (!) জর্জ বাবুর সিংহ চিত্তে এক অজানা আশঙ্কা খচ খচকরে বিধতে থাকে।

না, এ হতে পারে না। পৃথিবীকে বগলদাবা করে রাখতে হলে, পৃথিবীর মানুষের ওপর খোদায়ীত্ব জাহির করতে হলে, ওদের সমূলে বিনাশ করতে হবে। প্রভুর মর্জি বুঝতে পেরে উজির–নাজির, সেনাপতি–সৈন্যবাহিনী, পাইক–পেয়াদা, গোয়েন্দা সংস্থা, প্রচার মাধ্যম সবকিছু একযোগে হুমরি খেয়ে পড়ল 'মৌলবাদী মুসলমানদের' ধূলোয় মিশিয়ে দেয়ার মিশন নিয়ে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, এই ফেরাউনও তার মিশন শেষ করতে পারলেন না। তবুও তিনি অল্প সময়ে কম করে ছাড়েননি। অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ লিবিয়াকে বিশ্ব থেকে এক ঘরে করে ছেড়েছেন। ইরাকীরা আঙ্গুল উচিয়ে কথা বলার স্পর্ধা দেখিয়েছিলো, গোলামীর জিঞ্জর ভেঙ্গে ওদের মাথা উঁচু করে দাড়াবার শখ চেপেছিল। বলে একেবারে ধ্বংসস্তুপের নীচে ওদের কবর দিয়ে ছেড়েছেন। বসনিয়ার মুসলমানরা স্বাধীন হতে চাইছে বলে কৌশলে ওদেরও বিনাশ করার সুযোগ করে দিলেন হোয়াইট উল্‌ফ সার্বদের। এক ফেরাউন বিদায় নিয়েছে নতুন ফেরাউন মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে। পুরাতন ফেরাউনের পথ ধরে এ ফেরাউনও "মুসলিম দমন মিশন" আরও বেগবান করার উদ্যোগ নিয়েছে। ঢালাও ভাবে মুসলমানদের 'সন্ত্রাসবাদী' প্রমাণ করার অপচেষ্টা তারই আগাম পূর্বাভাষ মাত্র।

সদ্য সমাপ্ত আফগান জিহাদ থেকে প্রত্যাগত বিভিন্ন দেশের মুজাহিদরা দেশে প্রত্যাবর্তন করলে তাদের উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে ইসলামী আন্দোলন নতুন প্রাণ লাভ করে, নতুন ধারায় গতিশীল হয় জিহাদী আন্দোলন। মুজাহিদদের জিহাদী চেতনার ফলে আজ মিশরের জামায়াত আল–ইসলামীয়াহ, ইখওয়ানুল মুসলেমীন, ফিলিস্তিনে হামাস, আলজেরিয়ায় সালভেশন ফ্রন্ট, পাকিস্তান ও কাশ্মীরে হরকাতুল জিহাদ আল–ইসলামী, আল জিহাদ, আল বারক্, হিযবুল মুজাহিদীন ও মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ইখওয়ানুল মুসলে–মীন স্থবির হয়ে পড়া মুসলমানদের মধ্যে জিহাদী চেতনার সঞ্চার করে চলছে সব রকম দলন–পিড়ন উপেক্ষা করে।। নব্য ফেরাউনরা মুজাহিদের এ তৎপরতা সহ্য করতে পারছে না। তারা স্পষ্টতই এর মধ্যে ক্রুসেডকালীন আরব ও তুর্কী যোদ্ধাদের প্রতিচ্ছিবি দেখতে পাচ্ছে আর আতঙ্কে তড়পাচ্ছে, ঐ বুঝি মুজাহিদরা পুরো আরব আজমকে নিয়ে পাশ্চাত্যের ওপর চড়াও হল ভেবে। ফেরাউনের ঘরে ফেরাউন হন্তা মুসা (আঃ) যেমনি লালিত, পালিত হয়েছিলেন, তেমনি আধুনিক ফেরাউনদের 'আতঙ্ক' মুজাহিদরাও আমেরিকার প্রত্যক্ষ

মদদে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য পাকিস্তান এসে অত্যাধুনিক ট্রেনিং নেয়ার সুযোগ পেয়েছিল। ইতিহাসের পুণরাবৃত্তি কত চমৎকার ভাবেই না ঘটল!

তবুও ওরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। লিবিয়া, ইরান, সুদানকে সন্ত্রাসবাদী বলার ধৃষ্টতা দেখায়। পাকিস্তানের পিঠেও 'সন্ত্রাসবাদী' একটা ছাপ মারার জন্য সিল-ষ্ট্যাম্প নিয়ে প্রস্তুত। নিউ ইয়ার্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে বোমা হামলার জন্য মুসলমানদের জড়িত করার প্রণান্ত চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার মিথ্যে সন্দেহে মিশরের জামায়াত আল-ইসলামীয়ার প্রাণপ্রিয় নেতা যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছা নির্বাসন জীবন যাপনকারী অন্ধ খতীব শেখ ওমর আবদুর রহমানের বহিষ্কার দণ্ড ঘোষিত হয়েছে। ভারতে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার জন্য পাকিস্তান ও ভারতীয় মুসলমানদের দায়ী করে তাদেরও সন্ত্রাসী খেতাব দেয়ার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন বলে শুনা যাচ্ছে! ফিলিস্তিনের হামাস, কাশ্মীরের হরকত ও আল-জিহাদ ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করেও মুসলমান হওয়ার দোষে তারাও সন্ত্রাসী! আলজেরিয়ার সালভেশন ফ্রন্ট তাদের বিজয়কে অন্যায় ভাবে ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ লড়াই করছে বলে তারা 'মৌলবাদী' 'সন্ত্রাসী' উভয় খেতাবই লাভ করেছে। কিন্তু ভারত কাশ্মীরে এবং ইসরাইল অধিকৃত আরব ভূখণ্ডে যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে, ভারতের শীব সেনারা দাঙ্গার সময় মুসলমানদের যেরূপ নির্বিচারে হত্যা করছে এবং শীবসেনা নেতা বলরাম থাকার অসভ্যেরমত মুসলমানদের ভারত থেকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়ার দম্ভ প্রকাশ করলেও কিন্তু তারা সাম্প্রদায়িকও নয় এবং সন্ত্রাসী অপরাধ থেকেও পবিত্র থেকে যাচ্ছে। কত পরিষ্কার ওদের বিশ্লেষণ-বিচার।

বিশ্বের বুকে মুসলমানদের ঢালাও ভাবে 'সন্ত্রাসী' 'সাম্পদায়িক' 'মৌলবাদী' আখ্যা দিয়ে তাদের বিশ্ব শান্তি, সভ্যতার জন্য বিপজ্জনক প্রমাণ করার খেলায় মেতে উঠেছে। এই ফেরাউন ও হামানরা বিশ্বকে বোঝাচ্ছে, মুসলমানদের হাতে পারমানবিক বোমা, আত্মরক্ষার জন্য ব্যাপক আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র থাকাটা ঝুকিপূর্ন, বিশ্ব শান্তির জন্য তা বিপজ্জনক। নিজের হাতে কারি কারি পারমানবিক বোমা থাকলেও কোন দোষ নেই, তাতে নাকি শান্তির গেড়ো আরও মজবুত হবে। তাই পাকিস্তান, ইরান, লিবিয়াকে নিয়ে এত হৈ চৈ। ফেরাউন তার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পকেট সংস্থা জাতিসংঘকে ব্যবহার করে পাকিস্তান, ইরান, লিবিয়া, সুদানকে ইরাকের পথের পথিক বানানোর তয় তদবির করছে।

তাই যদি হয়, নিজের দেশ, জাতি, ধর্মকে রক্ষার জন্য লড়াই করে কোন মুসলমান যদি সন্ত্রাসী হয় তবে আমেরিকা রাষ্ট্রটি হবে মহা সন্ত্রাসী। ওদের স্বাধীনতা যুদ্ধটিই ছিল এক মহা সন্ত্রাস, ১৭৮৬ সালের ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন না করে 'সন্ত্রাস দিবস' পালন করা উচিত।

হিরোসিমা, নাগসিকার মহা অপরাধের জন্য হাজার বছর কান ধরে বিশ্ববাসীর নিকট ক্ষমা চাওয়া উচিত।

যুগে যুগে ফেরাউনরা অন্যায়কে ন্যায় আর ন্যায়কে অন্যায় বলে চালাতে চেয়েছে। আধুনিক বড় ফেরাউনটিও নিজেকে ন্যায়ের প্রতীক, বিশ্ব শান্তির মহাদূত ঘোষণা করে পূর্বের সূর্যকে পশ্চিমে উদিত করার স্পর্ধা দেখাচ্ছে। আর আমরা তা বুঝেও কিসের যেন ভয়ে বসে বসে ঝিমাচ্ছি। আমাদের বুঝতে হবে, ওরা বিশ্ব শান্তির নয় অশান্তির শিরোমনী। ওদের হাতে বিশ্ব কখনও নিরাপদ নয়।

বিশ্বের শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ মুসলমান জাতির ওপর ন্যাস্ত করেছেন। আমাদের গাফলতির জন্য ছোট জাতের বাচ্চারা বিশ্বের মোড়ল সেজে বসেছে।

আমাদের দায়িত্ব আমাদেরই বুঝে নিতে হবে। আমরা যতই দায়িত্ব পালনে গাফলতি করব কুচক্রীরা ততই অশান্তি সৃষ্টি করবে। মুহাম্মদী ঈমান আর ইসমাঈলী কোরবানী নিয়ে আমাদের ফেরাউনের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের সহায়। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত। ফেরাউনরা দরিয়ায় ডুবে মরে আর মুসার বাহিনী লাভ করে গৌরবময় বিজয়। এটাই দুনিয়ার ইতিহাস।

আল্লাহর পথে জিহাদ

আমীনুল ইসলাম ইস্‌মতী

মহা নবী (সঃ)–এর আবির্ভাবের সময় পৃথিবী ছিল জিহালাতের কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। মানন জাতির চরিত্র ছিল দানবতায় পরিপূর্ণ। লক্ষাধিক নবী রাসূল আনীত দ্বীনের আলোকশিখা হয়েছিল প্রায় নির্বাপিত। তাঁদের প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ছিল অবলুণ্ঠিত। সত্য ধর্মকে জলাঞ্জলী দিয়ে স্রষ্টাকে অবিশ্বাসের মাধ্যমে কেউ হয়েছিল বদ্ধ নাস্তিকে পরিণত আবার কেউ ধর্মের নামে প্রস্তর বা মাটির গড়া অসংখ্য দেবতার সম্মুখে ছিল মস্তকাবনত। সেবায় নিয়োজিত জড় পদার্থকে তারা বানিয়ে নেয় উপাস্য ও নমস্য। একদিকে স্রষ্টাকে অস্বীকার করার মত অহমিকা অপর দিকে সৃষ্টি বস্তুকে প্রভু মনে করার মত হীনমন্যতার ফলে মানুষ হারিয়ে ফেলেছিল তার প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা। যার ফলে সেদিনের সমাজে বিরাজ করছিল সীমাহীন নৈরাজ্য। এক সম্প্রদায় ছিল অন্যের প্রতি চরম বিদ্বেষী ও বৈরী ভাবাপন্ন। একে ছিল অপরের রক্ত পিপাসু। লোভ, লালসা, জিঘাংসা, হত্যা, লুণ্ঠনের ছিল অবাধ রাজত্ব। সুদ, ঘুষ, জুয়া, নারী ধর্ষন ও অপহরণ ইত্যাকার গর্হিত কর্মের দ্বারা সমাজ দেহছিল ক্ষতবিক্ষত। ন্যায়, সততা, সুচিন্তা ও পবিত্রতা হয়ে গিয়েছিল অপস্মৃত। মুক্তি ও প্রগতির আশা ছিল সুদূর পরাহত। মোদ্দা কথা, এমনি এক ঘোর দুর্দিনে মুক্তির পয়গাম নিয়ে আবির্ভূত হন স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও সর্বোত্তম আদর্শের পতাকাবাহী মহান মুক্তি দূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তৎকালীন ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থা ও (নোংরামী পূর্ণ মানুষের) প্রাত্যহিক জীবন ধারা তাকে ভাবিয়ে তুল্লো, অনেক ভাবতেন— একাকী নির্জনে চিন্তা করতেন, কোন পন্থায় এই সমাজ ভেংগে নতুন করে গড়া যায়? গভীর চিন্তা ও সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে হেরার নির্জন কন্দরে ধ্যানরত মহানবী (সঃ)–এর নিকট অবতীর্ণ হলো সত্যের অম্লান দীপশিকা আল–কুরআন। শান্তি ও প্রগতির অবরুদ্ধ দ্বার খোলার জায়নকাঠি। মহানবী (সঃ) সর্ব প্রথম সমাজের অভ্যন্তরে শান্তি স্থাপনে মনযোগী হন। রসূল (সঃ) প্রথমে সুদপদেশ ও হিকমতের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন, তিনি তাদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌছাতে থাকেন। কিন্তু সুবোধ খোকার মত মক্কাবাসীরা সত্যের স্বীকৃত দিল না। উপরন্তু তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে কঠোর বাঁধার সম্মুখীন হন। তাঁর পৌত্তলিক সম্প্রদায় প্রথমে তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তখন সত্যের প্রবর্তক মহানবী (সঃ) ক্রমবর্ধমান নির্যাতনের মুখে চরম সংকটের পাহাড় পাড়ি দিয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশে স্বীয়মাতৃভূমি ছেড়ে মদীনায় হিজরত করে চলে যান। কিন্তু সেখানেও তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলেন না। সেখানেও শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তখন রাসূল (সঃ)–এর উপর ধৈর্যধারণ করার আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ পাক তাঁকে উদ্দেশ্যে করে বলেনঃ "লোকে আপনাকে যা বলে তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।" (মুয্‌যাম্‌মিলঃ ১০)

কিন্তু যখনই কোন ধৈর্যের আয়াত অবতীর্ণ হতো তখনই তারা রসূল (সঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের উপর অত্যাচারের পেষনদণ্ড দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেত। উপরন্তু মুসলমানরা তাদের সংখ্যালঘুতা ও দুর্বলতা হেতু কাফেরদের মোকাবেলা করতে বাহ্যত সক্ষম ছিল না। কিন্তু রসূল (সঃ) যখন মদীনায় সুদৃঢ় ও স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন এবং মুসলমানদের সংখ্যাও বৃদ্ধিপায় তখন মুসলমানগণ শত্রুদের প্রতিরোধ করার চিন্তায় ব্রত হন।

ইসলাম শান্তির ধর্ম, সম্প্রীতির ধর্ম, ইসলাম সকলের সাথে মিলে মিশে বসবাস করার শিক্ষা দেয়। কিন্তু যখন এর শত্রুরা একে গ্রহণ না করে বরং এর সম্মুখে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ধরা পৃষ্ঠ হতে একে বিলীন করতে চায়, মানুষ হয়ে মানুষকে দাসত্বে পরিণত করার চেষ্টা চালায়, আর তাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রবেশ করতে বাঁধা দেয় তখন অস্তিত্বের সুরক্ষার প্রশ্নে তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ ভিন্ন কোন গত্যন্তর থাকেনা। বাধ্য হলো তারা তরবারী হাতে বাতিলের মুকাবিলায় ঝাপিয়ে পড়তে, শুরু হলো জিহাদ।

জিহাদের সংজ্ঞাঃ জিহাদ একটি আরবী শব্দ। আভিধানিকভাবে চেষ্টা, শ্রম, সাধনা, দুঃখ–যাতনা ভোগ–সংগ্রাম ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। পারিভাষিক ভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বস্তরে খোদায়ী আহকাম ও নবুবী আদর্শের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজের আভ্যন্তরীণ কুপ্রবৃত্তি ও বহিরাঙ্গনের সকল খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে সাধনা ও সংগ্রামের ধারাকে সদা অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাওয়ার নাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

জিহাদের অনুমতি ও উদ্দেশ্যঃ আল্লাহ্‌র ঘোষণা, "যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ

তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম; তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃষ্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনালয়, গীর্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্র নাম। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। আমি তাদেরকে তথা মুসলমানদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠিত করবে যাকাত প্রদান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্যে নিষেধ করবে; সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র ইখতিয়ারে।" (হাজ্জঃ ৩৯-৪১) উক্ত আয়াত গুলি দ্বারা সর্ব প্রথম জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়।

অন্যত্র আল্লাহ্ আরো ঘোষণা করেন, "হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম সেটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল"। (তাহরীমঃ ৯)

একটু গভীরভাবে দূরদৃষ্টি দিলে উপরোক্ত আয়াত গুলি থেকে আমরা জিহাদের উদ্দেশ্য ও এর অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে সহজেই অবহিত হবো। বাতিল শক্তিকে নির্মূল, পদদলিত মানবতার পুনরুদ্ধার এবং যারা ইসলামের সরল-সঠিক পথে আসতে ইচ্ছুক তাদেরকে ঐ পথে আনয়ন করা সর্বোপরী ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ নিস্কন্টক করাই জিহাদের মর্ম কথা।

আল্লাহ্র বাণীঃ "তোমরা তাদের সাথে সংগ্রাম করবে। তোমাদের হস্তে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন ও মুমিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন।" (তাওবাঃ ১৪)

রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেন, "কিয়ামতের পূর্বে আমাকে তরবারী দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন সকলে একক অদ্বিতীয় আল্লাহ্র বাধ্যগত হতে পারে।"

জিহাদের প্রয়োজনীয়তাঃ সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষের সার্বিক অশান্তি ও সর্বপ্রকার পতন থেকে রক্ষা করার গুরুত্ব যেমন সবচাইতে অধিক তেমনি তার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রাম করার প্রয়োজনীয়তাও সর্বাধিক। একারণই ইসলামী আদর্শে আস্থা স্থাপনের পর তার বিকাশ ও বাস্তবায়নের তাগিদের স্থান নির্ধারিত করা হয়েছে। মহানবী (সঃ) কে কোন্ কাজ শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন করা হলে তিনি ইরশাদ করেছিলেনঃ "আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন"। পুনরায় তারপরবর্তী শ্রেষ্ঠ কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করেছিলেনঃ "আল্লাহ্র পথে জিহাদ"। এই জিহাদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ ঘোষণা করেনঃ "আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হত। কিন্তু আল্লাহ্ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল।" (বাকারাঃ২৫১)

আল্লাহ্ আরো বলেনঃ "মানুষের মধ্যে এই দিনগুলির পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তণ ঘটাব যাতে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহ্ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না"।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় ব্যতীত আরো বহু আয়াতে জিহাদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যা সহজেই অনুমেয়।

জিহাদের মৌলিক কর্তব্যঃ জিহাদের প্রয়োজনীয়তা যেমন অপরিসীম, একে সাফল্যের পথে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্বও তেমন মহান। এ ক্ষেত্রে বাহ্যিক উপায় উপাদান তথা অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্যবল যেমন একান্ত প্রয়োজন, মানসিক শক্তি তথা চরিত্র, মনোবল, সৎসাহস, বিরত্ব, কৌশল, ধৈর্য প্রভৃতিও তেমনি অপরিহার্য। অবশ্য ইসলাম বাহ্যিক শক্তির চেয়ে আত্মিক শক্তির প্রতি বেশী গুরুত্ব আরোপ করে।

(ক) মানসিক প্রস্তুতিঃ জিহাদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ, কোমল-কঠিন সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন ধারণাই মানসিক প্রস্তুতির প্রধান ভিত্তি। এ পর্যায়ে জিহাদের সীমাহীন দুঃখ কষ্ট ও সংহারী রূপ দেখেই যদি মুসলিম উম্মত এর অফুরন্ত ও চিরস্থায়ী কল্যাণের কথা ভুলে যায় এবং একে অকল্যাণ মনে করতে আরম্ভ করে তাহলে আল্লাহ্র পথে জিহাদের গোটা সৌধই চুরমার হয়ে যেতে পারে। একারণেই আল্লাহ্ ঘোষণা করেনঃ "তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হলো যদিও তোমাদের নিকট তা অপ্রিয়; কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা পছন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন; তোমরা জাননা।" (বাকারা ২১৬)

তাওহীদের জলন্ত অনুভূতি তথা এক ও একক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের একাগ্রচিত্ত ইবাদতই শত সহস্র অমুসলিম ব্যক্তিকেও ভীত সন্ত্রস্ত করার ইতিহাস ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য। সুতরাং আল্লাহ্ বিরোধী শক্তির দোর্দন্ড প্রতাপ, সীমাহীন আস্ফালন, প্রচুর রণ সম্ভার, অগণিত সৈন্য-সামন্ত কোন কিছুতেই যাতে মুসলিম বাহিনী প্রভাবিত ও ভীত না হয় এবং যাতে তারা কাফিরদের অনুসরণ করতে শুরু না করে সে জন্যই আল্লাহ্ সাবধান বাণী উচ্চারন করে ইরশাদ করেছেনঃ "হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।" (আল-ইমরানঃ ১৪৯)

পৃথিবীর তথাকথিত যাবতীয় ধর্ম ও মতাদর্শ মানুষকে অনিবার্য ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যায় এবং এ কারণেই এর ধারক ও বাহকসহ সকল কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হতে হয় গোটা মুসলিম উম্মতকে। তাই কফিরদের সকল শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করাই হলো মুসলিম বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য। এর জন্যে চাই কাফিরকে চির শত্রু তথা চরম বিরোধী শক্তি রূপে গণ্য করার মনোভাব। চাই তাদেরকে আপন মনে করার যাবতীয় দুর্বলতা থেকে আত্মরক্ষা করার চৈতন্য। নইলে জিহাদের সাফল্য আকাশ-কুসুম কল্পনাই মাত্র। সুতরাং যাতে কোন মুসলিম কোন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে মুসলিম উম্মতকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করতে না পারে সেজন্যে আল্লাহ্ ইরশাদ করেনঃ "হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কৃত করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্কে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছো? তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তা করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ হতে।" (মুমৃতাহানাঃ ১)

আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেছেনঃ "মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর।" (আলে-ইমরানঃ ২৮)। এরপরেও যাতে কোন মুসলমান যুদ্ধের কষ্ট ভোগের আশংকায় প্রাণের মমতায় আরাম আয়েশের বন্ধনে, আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি কিংবা ধন-ঐশ্বয্যের মোহে জিহাদের মহান কর্তব্যের কথা ভুলে যায় সেজন্য মাহনবী (সঃ) কঠিন সাবধান বানী উচ্চারণ করে ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি জিহাদ করেনি, কোন জিহাদকারীর অস্ত্র-শস্ত্রেরও ব্যবস্থা করেনি, কিংবা কোন জিহাদকারীকে যুদ্ধে প্রেরণ করে তার পরিবার পরিজনের দেখাশোনাও করেনি, কিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ্ তাকে কোন একটি কঠিন বিপদে ফেলবেনই"। (আবু দাউদ)

তিনি আরো ইরশাদ করেনঃ "যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয় যে না জিহাদ করেছে আর না সে কোন দিন জিহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেছে সে ব্যক্তি মুনাফেক হয়ে মৃত্যু করণ করবে।" (মুসলিম)

(খ) বাহ্যিক প্রস্তুতিঃ গোটা পৃথিবীই নৈমিত্তিক। বাহ্যিক উপায়-উপকরণ সকল কাজের জন্যেই অপরিহার্য। ইসলাম তাই জিহাদের ক্ষেত্রেও মানসিক প্রস্তুতির সাথে সাথে বাহ্যিক প্রস্তুতির উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। আল্লাহ্ ইরশাদ করেনঃ "তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এরদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্র শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে এবং এদদ্ব্যতীত অন্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ জানেন, আল্লাহ্র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।" (আন ফালঃ ৬০)

জনশক্তি ও অস্ত্রবলই যুদ্ধের বাহ্যিক প্রস্তুতির সর্ব প্রধান অবলম্বন। আর জন শক্তিকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র, যানবাহন ও অন্যান্য সরঞ্জাম। এর সীমাহীন গুরুত্বের কথা যাতে কোন মুসলিম ভুলে না যায়, কিংবা ধন-সম্পদের স্বাভাবিক মোহে এতে যাতে বিন্দু মাত্রও কার্পণ্য না ঘটে সেজন্যে আল্লাহ্ জীবন দেওয়ার পূর্বে ধন-সম্পদ দেয়ার কথা উল্লেখ করে ঘোষণা করেছেনঃ "হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে শ্রেয় যদি তোমরা জানতে"! (সাফফঃ ১১-১২)

আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য জনশক্তির পরেই দরকার প্রয়োজনীয় অর্থের এবং যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র ও খাদ্য ও চিকিৎসা সমাগ্রীর। মহান আল্লাহ্ এ অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রীর সহযোগীতাকে উত্তম ঋণ নামে অভিহিত করে ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। কে সে যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন।" (বাকারাঃ ২৪৪, ২৪৫)

এবং ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর-করতে থাক, যতক্ষণ না ফিত্না-অখোদায়ী বিধান নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন-আনুগত্য, শাসন ও আইন কেবলমাত্র আল্লহ্র জন্যই হয়।

-আল-কুরআন

ফারুকী ট্রাস্ট বাংলাদেশ
এর কর্মসূচী ও
সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দেশ ও মিল্লাতের এছলাহ ও খেদমতের মহান জযবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজ থেকে দু'বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের মহান খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর পূণ্য নাম বিজড়িত এক খালেছ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ফারুকী ট্রাষ্ট বাংলাদেশ বর্তমানে তার সকল বিভাগে পূর্ণ উদ্যোগে তৎপরতা শুরু করার পদক্ষেপ নিয়েছে। জন্ম লগ্ন থেকে এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সমাজ—কল্যাণমূলক কাজের পাশাপাশি লিফলেট প্রকাশ, আদর্শ মক্তব কায়েম ও বিভিন্ন মাদ্রাসা সমূহে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে আসছে। এখন নদওয়াতুল উলামা লখনৌ ও স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত এদারাতুল মাআরিফের ন্যায় একটি উচ্চাঙ্গের গবেষণা একাডেমী ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার জন্য জোরদার মেহনত করছে। এ প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সকলের আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

মহাসচীব

ফারুকী ট্রাষ্ট বাংলাদেশ

৭৮/১ ঢালকানগর লেন,
গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।

ভারতের হিন্দু করসেবকরা চরম আতঙ্কিতঃ

বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারী পাপিষ্ঠরা অন্ধ হয়ে যাচ্ছে

অন্ধ হয়ে যাচ্ছে ভারতের পাপিষ্ঠ করসেবকরা। পৃথিবীর রূপ-সৌন্দর্য দর্শনের সুযোগ থেকে চিরতরে বঞ্চিত হচ্ছে আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় দুশমন পৌত্তলিকরা। ফিউজ হয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক বাল্বের মত ওদের চোখের জ্যোতি নিভে যাচ্ছে। আর এই ব্যাপক আযাব-গজবের মুখোমুখি হচ্ছে ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংসের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যে সমস্ত উগ্র হিন্দু করসেবকরা জড়িত তারা। যারা এই মসজিদটিকে শহীদ করার তাণ্ডবে সরাসরি অংশ নিয়েছিল তারা এখন একে একে অন্ধত্বের শিকার হচ্ছে। কেউ জানে না হঠাৎ কি কারণে বেছে বেছে করসেবকরা অব্যাহত ভাবে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই মহামারীর মত করসেবকদের মধ্যে এই অন্ধত্ব ছড়িয়ে পড়ায় বাকী করসেবকদের মধ্যে দাবানলের মত একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। এই আজাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এখন তারা দিবারাত্র শুধু রামজী আর দূর্গার মূর্তীর পদতলে মাথা ঠুকছে। চোখের মায়ায় তারা দুনিয়া ছেড়ে পাতালে আশ্রয় নিতে পারলে যেন বাঁচে। কিন্তু হতভাগারা জানে না, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌ যখন তাঁর দুশমনদের নিজ হাতে শাস্তি প্রদান করতে উদ্যগী হন তখন কেন পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই যা' তাদের এই শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে। ইতিহাস সাক্ষী, অতীতে আল্লাহ্‌ তায়ালা নমরুদ, ফেরাউন, সাদ্দাদকে তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য ধ্বংস করে দিয়েছেন। আদ, সামুদ ও নুহ (আঃ)-এর কওমকেও তিনি ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কাবা শরীফ ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল বলে আবরাহার ঔদ্ধত্যকে চূর্ণ করেছিলেন একঝাক ক্ষুদ্র পাখির সাহায্যে। ফেরাউনের লাশকে সমুদ্রের তীরে নিক্ষেপ করে এবং আবরাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচে গলে ঝড়ে যাওয়ার পর একটি মাংস পিণ্ডের ন্যায় ইয়ার্মেনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে তিনি বাকী মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ যুগে যুগে আল্লাহ্‌র এত ব্যাপক আজাব গযবের প্রত্যক্ষ উদারহণ থেকে খুব কমই শিক্ষা নেয় না। তারা আল্লার অবাধ্যতায় আরও মেতে ওঠে, দম্ভ-অহংকারে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, ক্ষমতার দাপটে তারা আল্লাহ্‌র ঘর পবিত্র মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করে। মসজিদকে শহীদ করতেও ওরা কুণ্ঠিত হয় না। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেছেন, "তোমরা সীমা লংঘন করো না। আল্লাহ্‌ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

কিন্তু পৌত্তলিক করসেবকরা সীমা লংঘন করতে করতে আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদের ওপর চড়াও হয়েছে। মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করে সেখানে রামের মূর্তী স্থাপন করেছে, মসজিদের ধ্বংসস্তুপের ওপর মন্দির স্থাপন করে ওরা পূজা-অর্চনায় মগ্ন হয়েছে। ওদের ধৃষ্টতা আবরাহার দম্ভকেও ছাড়িয়ে গেছে। সম্প্রতি করসেবকদের পরিণতি সম্পর্কে খরব পাওয়া যাচ্ছে যে, সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ কোন প্রকার ঘটনা-দুর্ঘটনা, রোগ ছাড়াই একমাত্র মসজিদ ধ্বংসের সাথে জড়িত করসেবকরাই ধীরে ধীরে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে একসময় সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে যা' পৃথিবীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিরল। আমাদের বিশ্বাস, এটা সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌ কর্তৃক ব্যাপক আযাব নাজিলেরইআলামত।

নয়াদিল্লীর জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন আনসারী এক্সপ্রেস এর ৪-১০ জানুয়ারী '৯৩ সংখ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারীদের ওপর খোদায়ী শাস্তির এ চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রফেসর মমতাজ আনসারী প্রতিষ্ঠিত ও মুহাম্মদ আতাহার হোসাইন সম্পাদিত এ সাপ্তাহিকীর পাটনাস্থ রিপোর্টার সৈয়দ জাবেদ হোসাইনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, "বিগত ৬ই ডিসেম্বর অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার ন্যাক্কারজনক কাজে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত করসেবক বাহিনীতে কয়েকটা দল বিহারের ছাপরা শহর এবং উত্তর প্রদেশের গাজীপুর ও গোরখপুর জিলা থেকেও অংশ নিয়েছিল। বলা বাহুল্য, হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে করসেবকরা এমন নারকীয় কাজে যোগদান করেছিল। দক্ষিণ ভারত থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক করসেবক এ কূখ্যাত বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য অযোধ্যায় এসেছিল। কিন্তু তারা বাবরী মসজিদ ধ্বংসে তেমন তৎপর ছিলো না। পরিকল্পিত পন্থায় যেসব করসেবক বাবরী মসজিদ শহীদ করার কাজে তৎপর ছিল তাদের মধ্যে ৩১ জন বিহার প্রদেশের সারেন জিলার ছাপরা শহরের বাসিন্দা।"

ঐ প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, আল্লাহ্‌র পবিত্র ঘর ভাংগার শাস্তি স্বরূপ এ পর্যন্ত ছাপরা শহরের দাহিয়ান মহল্লার ১৭ জন, উত্তর প্রদেশের গাজীপুর জেলার ৯ জন ও গোরখপুরের ৫ জন করসেবক তাদের চোখের জ্যোতি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে অন্ধ হয়ে গেছে। এসব করসেবক ৯ই ডিসেম্বর অযোধ্যা থেকে তাদের নিজ বাসস্থানে ফিরে আসে। কয়েকদিন পর রাতে তারা চোখে ব্যাথা অনুভব করতে থাকে। বিহারের সারেন জিলার ছাপরা শহরের ১৭ জন করসেবক যারা একই দাহিয়াবান মহল্লার লোক ছিল তারা পরদিন ডাক্তারের নিকট এসে চোখের ব্যাথার কথা বলেল ডাক্তারগণ তাদের চোখ দেখে তা' 'সামান্য ব্যাপার' বলে শান্তনা দিয়ে সামান্য ওষুধ দিয়ে তাদের বিদায় করেন। কিন্তু তাতে তাদের চক্ষু যন্ত্রণা প্রশমিত না হয়ে ক্রমশ বাড়তে থাকে। এরপর অভিবাবকরা তাদের পাটনায় এনে চক্ষু বিশেষজ্ঞদের দেখালেন।

অত্যাধুনিক যন্ত্র দিয়ে তাদের চক্ষু পরীক্ষা করা হল, ব্যাথা প্রশমনকারী ওষুধও প্রয়োগ করা হলো। কিন্তু এক সপ্তাহ পর ঐ চক্ষু যন্ত্রণা অন্য রূপ ধারণ করে। উক্ত ১৭ জন করসেবকই ডাক্তারদের নিকট একই অভিযোগ করে যে, তাদের চোখে এখন আর ব্যথা নেই। কিন্তু তারা কেউই আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তাদের চোখের জ্যোতি চির দিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে।

ডাক্তারগণ পুনরায় তাদের পরীক্ষা করলেন। কিন্তু তাদের বোধগম্য হচ্ছে না, চোখের দৃষ্টি কোন কারণে নষ্ট হল? প্রকাশ্যভাবে উন্নতমানের পরীক্ষা নিরীক্ষা সত্ত্বেও চোখের জ্যোতি সম্পূর্ণ রূপে চলে যাওয়ার কারণ বুঝতে না পারায় চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ হতভম্ব হয়ে গেলেন।

বিহারের ছাপরা শহরের যেসব করসেবক চোখ হারিয়েছেন তাদের নামঃ কৃপা শঙ্কর, অনন্ত প্রসাদ, সুশীল প্রসাদ, রাজেন্দ্র গুপ্ত, মিতলেশ কুমার, যতীন্দ্র কুমার, সুভাষ সিংহ, নন্দ কুমার সিংহ, অজীত কুমার সিংহ, শুভরাম শর্মা, কৃষ্ণকান্ত ওঝা, দেব কুমার ওঝা, জনার্দন তেওয়ারী, কৃপারাম, অজয় পান্ডে, কমলেশ পান্ডে এবং গোপাল পান্ডে।

ঐ সব করসেবক একই মহল্লার বাসিন্দা। তারা মোলায়েম সিং ক্ষমতাসীন থাকা কালেও বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অযোধ্যায় এসেছিল। এদের বয়স ২৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। এসব পাপিষ্ঠের এ শোচনীয় অবস্থা দেখার জন্য তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব শুভাকাংখীরা পাটনায় এসে ভীড় জমাচ্ছে। যেহেতু এদের চিকিৎসা চলছে পাটনা শহরের রাজেন্দ্র নগর কলোনীর ৬নং ও ৯নং রোডে অবস্থিত দক্ষ বিশেষজ্ঞদের প্রাইভেট ক্লিনিকে। ডাক্তারগণ করসেবকদের নিকট থেকে চিকিৎসা বাবদ টাকা পয়সা দাবী করেনি। শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওষুধ পথ্যের খরচই নিয়েছেন। রাজেন্দ্রনগরের বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ গাঙ্গুলী তাদের চিকিৎসার জন্য দিল্লী পাঠাতে পরামর্শ দিয়েছেন। ডাক্তার গাঙ্গুলী ডায়গনোসিস করে বলেছেন যে, মসজিদ ভাঙ্গার সময় পতিত ধুলাবালি দ্বারা তাদের চক্ষু সামান্য প্রভাবিত হতে পারে। বলা বাহুল্য, পবিত্র মসজিদের ঐ সমান্য ধুলাকণাই আবরাহার এসব পাপিষ্ঠ উত্তরসূরীর চোখে আবাবিল পাখির প্রস্তর কণার রূপ ধারণ করে চরম আঘাত হেনেছে এবং চিরদিনের জন্য তাদেরকে অন্ধ করে দিয়ে বিশ্বের মুসলিম বিদ্বেষীদেরকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে।

উত্তর প্রদেশের গাজীপুর জেলার ৯ জন করসেবকেরও এ ধরণের অবস্থার খবর পাওয়া গেছে। তারাও চোখের মত মূল্যবান নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাদের চোখেও প্রথমে জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভূত হয়েছে। যমুনারাম ও সত্যরাম প্রথমে চোখে গোলাপ জল দেয় কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। তারা গাজীপুরে সরকারী হাসপাতালে গিয়ে চক্ষু বিভাগের চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হয়। তখন পর্যন্ত তাদের চোখের জ্যোতি ঠিক ছিল। কিন্তু কিছু দিন পর চোখের নিম্নভাগে ঝাপসা ঝাপসা দেখতে লাগলো। মনে সন্দেহ জাগলে তারা গাজীপুরের একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞকে দেখায়। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা গেল যে, চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। চিকিৎসা চলতে থাকলো কিন্তু এক সপ্তাহ পর দেখা গেল যে, তাদের চোখের জ্যোতিঃ চিরতরে হারিয়ে গেছে। ডাক্তারগণ বললেন, হয়ত চোখে পাথর কণার আঘাত লেগেছে। যমুনা রাম ও সত্যরাম নামক পাপিষ্ঠদ্বয় চোখের জ্যোতি হারিয়ে অত্যন্ত অনুতপ্ত। তারা কান্নকাটি করছে আর বলছে "আমরা অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ভেঙ্গেছি, তাই ভগবান অসন্তুষ্ট হয়েছেন।" তারা অনুভব করতে পারছে যে, ধর্মের পবিত্র স্থানের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করার শাস্তি এ ধরনের মারাত্মক হয়ে থাকে যা তাদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে।

এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য করসেবকরা গাজীপুর থেকে চিকিৎসার জন্য লাখনৌ পৌছেছে। তারাও প্রথমে একই ধরণের চক্ষু যন্ত্রণা ভোগ করেছে। সপ্তাহ খানেক চিকিৎসার পরও চোখের আলো ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। তবে এ সাতজন করসেবকের চোখের জ্যোতি এখনো সম্পূর্ণ নষ্ট হয়নি। বরং ঝাপসা দেখছে। এদের তিন জনের নাম এ পর্যন্ত পাওয়া গেছেঃ গোপাল সিং, নন্দ সিং ও বিজু সিং, অন্যান্যদের নাম ঠিকানা এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

গোরখপুর জিলার পাঁচজন করসেবক, বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার ক্ষেত্রে জঘন্যতম ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে স্থানীয় লোকসভার সদস্য মোহন্ত ও ভেদনাখের সাথে। তাদের নির্বাচনের সময়ও এ পাঁচজন বিশেষ তৎপরতা চালিয়েছিল, তাদেরই ইঙ্গিতে অনন্ত প্রসাদ গাওয়া, সন্তোষ কুমার, যোগেন্দ্র পাণ্ডে দীপচাদ এবং জয় প্রকাশ করসেবক রূপে অযোধ্যায় এসেছিল। উল্লেখ্য যে, লোকদেরকে এ ধরণের জঘন্য কার্য ও সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য যথা নিয়মে ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল। তাদেরকে কোথায় ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল তার ঠিকানা এখনো পাওয়া যায়নি। তবে অনন্ত প্রসাদ ওরফে গুমার পিতা মদন প্রসাদ ইতিপূর্বে ঐ করসেবকদের ট্রেনিং দেয়া হয়েছে বলে স্বীকার করেছে। এ পাঁচজনের মধ্যে ৩ জনের চোখের জ্যোতিঃ সম্পূর্ণরূপে চলে গেছে এবং যোগেন্দ্র পাণ্ডে ও দীপচাঁদের চোখের আলো আশংকাজনক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। তাদের চিকিৎসা এখনোচলছে।

বিহারের ছাপরা শহরের দাহয়াবান মহল্লার জনসাধারণের মধ্যে এখন এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, এসব লোক মসজিদ ভাঙ্গার মত ঘৃণ্য কাজে অংশ নিয়েছে বলে তারা এমন জঘন্য অভিশাপের শিকার। আর মহিলা ও হিন্দু পুরোহিতদের মত হচ্ছে, "লোকদেরকে পাপ স্পর্শ করেছে"। সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'আনসারী' উল্লেখিত প্রতিবেদনে একথাও লিখেছে যে, তাঁরা ঐ সব পাপিষ্টদের ছবি সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ছবি পাওয়া মাত্রই সেগুলো বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা হবে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মাত্র তিন জনের ছবি হস্তগত হয়েছে। গাজীপুর ও গোরখপুরে লোকজনের মধ্যে এ ধরণের খোদায়ী আযাব আসায় আতংক পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ভাষান্তরঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

ফিলিস্তিনে হামাসের উত্থান ঃ

ইসরাইল থরথর কাঁপছে

মুহাম্মাদ শেখ ফরিদ

মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের ইহুদীদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। ওরা এখন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। রাতের বেলা জেগে জেগে দুঃশ্চিন্তায় কাটাচ্ছে প্রতিটি অভিশপ্ত ইহুদী। ঘুমের ঘোরে দেখতে পাচ্ছে খেজুর তলার মরুচারী সেই দুর্ধর্ষ মরুশার্দুলরা আবার জেগে উঠেছে। ফিরে পেয়েছে তাদের হারানো সৌর্য-বীর্য। হাতে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে বিশ্বখ্যাত আরবী ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আবার ছুটে আসছে জেরুজালেম উদ্ধার করতে। আর এই দুরন্ত বাহিনীর পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এককালের পাশ্চাত্যের মহা আতংক সালাউদ্দিন আইউবী।

হ্যা, ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে গাজী সালাউদ্দিন জিহাদ ঘোষণা করে জেরুজালেম অভিমুখে যাত্রা করলে পাশ্চাত্যের ক্রুসেডারদের ঘরে ঘরে যে কান্নার রোল উঠেছিল, মুসলমানদের হাতে জেরুজালেমের পতন এবং পাশ্চাত্যের কাছে যেমন এ দুঃসংবাদ বজ্রপাতের ন্যায় আঘাত করেছিল, মধ্যপ্রাচ্যে উড়ে এসে জুড়ে বসা ইহুদীদের মনে এখন সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সাদ্দাম হোসাইনের স্কাড মিসাইলের ভয়ে ওরা একবার ইঁদুরের মতো মাটির তলায় গর্ত খুড়েছিল, কিন্তু এবার আতঙ্কে কারবালার মাতম করতে শুরু করেছে। আর এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে ধুমকেতুর ন্যায় আবির্ভূত ইসলামী জিহাদ ভিত্তিক ফিলিস্তিনী এক সংগঠন। যার নাম হামাস। হামাসের উথানকে গাজী সালাউদ্দিনের উথানের সাথে মূল্যায়ন করতে ইহুদী পত্রিকাগুলোও আজ সরব।

১৯৮৭ সালে হামাস সাংগঠনিক রূপ ধারণ করে এবং ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। ইন্তিফাদা আন্দোলনের সময় হামাসের কার্যক্রম ব্যাপক সমর্থন লাভ করে, এ সময় হামাসের কর্মীরা আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকাও রাখে। ইসরাইল অধকৃত গাজা ভূখণ্ডের গজওয়া পট্টিতে এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে হামাসের অভ্যুদয়। গত ১৪ মাস ধরে হামাসের তৎপরতা বেগবান হয়ে গাজা-ভূখণ্ডে ছাড়িয়ে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। হামাসের প্রতিটি কর্মী জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত। তারা ইসরাইল রাষ্ট্রটির সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হওয়ার পক্ষপাতি। ইসরাইলের ধ্বংসস্তূপের ওপর একটি স্বাধীন ইসলামী ফিলিস্তিন কায়েমই তাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা তাদের মাতৃভূমিকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন দেখতে চায়। এ ব্যাপারে কোন কাটছাট বা ইহুদীদের সাথে নিছক বাগাড়ম্বর কোনটাই তারা মানতে রাজি নয়। হামাসের একজন শীর্ষ স্থানীয় নেতা বলেন, "আমরা দীর্ঘ ৪৬ বছর যাবত বিভিন্ন আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছি। ইহুদীবাদ, খৃষ্টান আরব জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, সেকুলারিজম দেখেছি। জাতিসংঘ নামক আমেরিকান গৃহপালিত প্রতিষ্ঠানটির কীর্তিকলাপেরও আমরা কম ভূক্তভোগী নই। সব আন্দোলনের মাধ্যমেই আমরা ভাগ্য পরীক্ষা করেছি। কিন্তু আমাদের আসল সমস্যার কোন সমাধান পাইনি। এখন আমরা একটা সর্বশেষ সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, শুধু ইসলামই আমাদের ইজ্জতকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আলোচনার মাধ্যমেও যে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান হবে না তা গত ১৪ মাসে প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান সম্ভব। জিহাদই মুসলিম জাতির গৌরব ও আত্মমর্যদার চাবিকাঠি। দুনিয়ার সমস্ত দাম্ভিক শক্তির সাথে পাঞ্জা লড়ার সাহস নিয়ে হাতিয়ার তুলে নেয়ার আগ পর্যন্ত ঈমানদারের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে না।

মূলত হামাসের এই আপোসহীন ভূমিকা ভাগ্যহারা ফিলিস্তিনীদের বুকে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ধুধু বালুকাময় অনুর্বর ভূমি, কর্মসংস্থান এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণের তীব্র অভাবের কষাঘাতে জর্জরিত। ইসরাইলী সৈন্যদের হাতে অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডের ১৮ লাখ ফিলিস্তিনী নতুন করে সাহস পাচ্ছে। তারা এখন হামাসের সংস্পর্শে এসে ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী জীবনযাপন করছেন। অধিকাংশ মহিলা পর্দাকে মেনে চলছেন। পতিতাবৃত্তি ও মাদক সেবন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শরিয়ত বিরোধীদের কঠোর সাজার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিষেধ অমান্যকারীদের হত্যা করে তাদের লাশ জনগণের শিক্ষার জন্য খোলাস্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয়। অধিকৃত ভূখণ্ডের ৪০% লোকই হামাসের সদস্য। হামাসের এই হঠাৎ উদয় এবং ক্রমশক্তি বৃদ্ধিতে পিএলও'র সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গি প্রচণ্ড চাপের মুখে। তাদের জনপ্রিয়তা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। তেলআবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রধান প্রফেসর ইলা বেকহেস বলেন যে, "হামাস পিএলওর প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হচ্ছে এবং ইসরাইলের জন্য ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। হামাসের শক্তি বৃদ্ধির জন্য পিএলও ইসরাইল আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। অথচ ইসরাইলের জন্য আলোচনা চালিয়ে যাওয়াই ছিল ভাল। কেননা, পিএলও ভাগভাটোয়ারায় প্রস্তুত ছিল।"

নাজহা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রফেসর আবদুস সাত্তার কাসেমী বলেন, "পিএলওর দীর্ঘদিনের একঘেয়ে আন্দোলন ও ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণেই ফিলিস্তিনীরা পিএলও থেকে হামাসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এই অবস্তায় হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে জীবন-মরণ দীর্ঘ রক্তক্ষীয় সংগ্রামের পটভূমি সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ এবং ইসরাইল এটা দেখতে রাজি নয়।"

গত বছর হামাসের পুরো দুনিয়ার জিহাদী আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে আফগান মুজাহিদদের সাথে রয়েছে এঁদের গভীর সম্পর্ক। আফগান জিহাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ আফগান ফেরত ফিলিস্তিনী মুজাহিদরাই এ সংগঠনের চালিকা শক্তি। দলের মুখপাত্র ডঃ মোহাম্মদ জাহের বলেন, 'আফগান জিহাদ আমাদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছে। সশস্ত্র জিহাদের খুন রাঙা পথে এখন আর আমরা ভীত নই।'

পৃথিবীর কোন বৃহৎ শক্তির আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। পাশ্চাত্যের জড়বাদী সমাজ আমাদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেয়া ছাড়া কোন সহযোগিতাও করবে না। আমরা ইসরাইলের সমর শক্তি নিয়েও চিন্তিত নই। বিশ্বের দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো লাইন ও শ্রেষ্ঠ কমাণ্ডো বাহিনী গড়ে ইসরাইলের আত্মপ্রসাদ লাভ করার কিছু নেই। কেননা, মুসলমানরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করে বলে আল্লাহ্‌ই তাদের বড় সাহায্যকারী হয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরাশক্তি রাশিয়াও একদা শত্রুর বেশে শ্রেষ্ঠ কমাণ্ডো ও মরণাস্ত্র নিয়ে আফগানিস্তানের ওপর ঝাপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু তারাই আফগানীদের বিজয় লাভে বেশী সাহায্য করেছে। তারা আফগানিস্তানে যে বিপুল সমরাস্ত্র রেখে গেছে তা' দিয়ে আমেরিকার ন্যায় পরাশক্তির সঙ্গে ১০ বছর যুদ্ধ করা যাবে। সুতরাং আমাদেরও আল্লাহ্‌র ওপর আস্থা থাকলে ইসরাইলের বিপুল সমরাস্ত্রের গুদাম পাশ্চাত্যের ক্রুসেডের মোকাবিলায় কাজে লাগতে পারে। দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো লাইন হতে পারে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা লাইন। হামাসের এই দৃঢ় প্রত্যয় ইসরাইলীদের মনে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করেছে। উপরন্তু গত ডিসেম্বর মাসে হামাসের এক সামরিক অভিযানে ৫ জন সৈন্য নিহত এবং একটি ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়। অন্য এক ঘটনায় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের একজন সেনা নিহত হলে সমগ্র ইসরাইলে ব্যাপকভাবে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮২ সালের পর ইসরাইলের ভেতরে এতবড় ঘটনা এই প্রথম। ইসরাইল এ ঘটনার প্রতিশোধ স্বরূপ ৪১৮ জন ফিলিস্তিনী বুদ্ধিজীবীকে 'নোম্যান্স লাণ্ডে' বহিস্কার করে। বহিস্কৃত ৪১৮ জনের মধ্যে ২৫০ জনই উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রীধারী, ১৮ জন পিএইচডি, ২৫ জন প্রফেসর, ১৮ জন ইঞ্জিনিয়ার, ১০৮ জন মসজিদের বিশিষ্ট ইমাম। এরা সবাই হামাসের সদস্য না হলেও ইসলামী জিহাদের প্রতি ঝুঁকে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় তাদের বহিস্কার করা হয়েছে। ইসরাইলী প্রধান মন্ত্রী আইজাক রবিন তার মুখপাত্রের পত্রিকা আদিদ বিন আমির সাথে এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন যে, "হামাসের তৎপরতায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, "হামাস এবং অধিকৃত এলাকায় জিহাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করা ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই। এই উদ্দেশ্যেই ফিলিস্তিনীদের বহিস্কার করা হয়েছিল। বাস্তবে এর উল্টোটা ঘটেছে। হামাস এই বহিস্কার ঘটনায় বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।"

বরজিয়াত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর আবু আমেরও রবীনের সুরে সুর মিলিয়ে বলেছেন, "ফিলিস্তিনীদের বহিস্কার ঘটনায় হামাসের সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মনোবল বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের সদস্যদের মধ্যে আগ্রহ দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নোম্যান্সল্যাণ্ডে আটকে পড়া ফিলিস্তিনী বুদ্ধিজীবীরাও হামাসকে তাদের ভবিষ্যৎ মুক্তির পথ বলে ভাবতে শুরু করেছে। তারা তুষার ও বরফের মধ্যে জনমানবহীন পার্বত্য ভূমিতে আটকে পড়েও এই অঙ্গীকার করেছে যে, আমাদের মায়ের কসম আমরা আমাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যাবই এবং ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রকে আমাদের শরীরের তাজা রক্ত দ্বারা শীতল করবই, ইসরাইলের হিংস্রতার বদলা নেবই। বহিস্কৃত ফিলিস্তিনীদের এ অনমনীয় ভূমিকার কারণে ইসরাইল তাদের ফিরিয়ে নিতেই এত ছল-চাতুরী করছে।"

হামাসের এই ভাবমূর্তির কারণে প্রতিটি ইসরাইলী মনে করে, হামাস ইসরাইলের জন্য মরণফাঁদ। এর সম্পূর্ণ ধ্বংস ছাড়া ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও ফিলিস্তিনের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ইসরাইলের উচিত হামাসের শক্ত ঘাঁটি গজওয়া পট্টি ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেয়া। কেননা এই গজওয়া পট্টি থেকেই পুরো গাজা এরাকায় হামাসের তৎপরতা নিয়ন্ত্রিত হয়।

গাজা এলাকার সৈন্যরা এখন আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। প্রথম প্রথম হামাসের কর্মীরা তাদের ওপর বোতল, দেশীয় তৈরী গ্রেনেড, হাত বোমা ও পাথর ছুড়ে মারত। বর্তমানে তারা মিশর ও ইসরাঈলী চোরাচালানীদের নিকট থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সংগ্রহ করে তাদেরকে নিশানা বানাচ্ছে। গাজা এলাকায় গুলী বিনিময়, চোরাগুপ্তা হামলা ও ইসরাঈলী সৈন্যদের অস্ত্র কেড়ে নেয়া হামাসের কীদের রুটিন কাজে পরিণত হয়েছে। তাই রবীনের লেবার পার্টির দুই-তৃতীয়াংশের বেশী সদস্য ও ৪ জন কেবিনেট মন্ত্রী সম্প্রতি রবিনকে পরামর্শ দিয়েছে যে, অবিলম্বে পিএলওর প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি করা হোক এবং তাদের সাথে শান্তি আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হোক। এর মাধ্যমে হামাসের উত্থান ঠেকানো যেতে পারে। কিন্তু রবিন এ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন, আরব অধিকৃত এলাকাকে আরও উত্তপ্ত করা এবং ফিলিস্তিনের ভাগ্যকে পিএলওর ওপর ছেড়ে দিতে সম্মত নয়। তবে হামাসের শক্তি বৃদ্ধি পাক তাও চান না। অবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকলে তাদের এ পরামর্শ যে কোন সময় মেনে নেয়াও অসম্ভব নয়। ইতোমধ্যে পিএলও'র সাথে যোগাযোগ করার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে সে পথে এক কদম এগিয়েও গেছে।

আমার দেশের চালচিত্র

ফারুক হোসাইন খান

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনা শেষে আমাদের জীবনে এসেছিল আরও একটি ঈদ পর্ব—ঈদুল ফিতর। প্রতিটি বিশ্ব মুসলিমের হৃদয়ে আনন্দের প্লাবন বইয়ে দিয়ে অবশেষে সেও চুপি চুপি কালের গর্ভে মুখ লুকাল। দীর্ঘ এক মাস যাবৎ যাবতীয় লোভ, লালসা, ভোগ ও পাপকার্য থেকে আমাদের মুক্ত রাখার ও কঠোর সাধনার মাস রমযান। সামর্থ ও সাধ্য অনুযায়ী নিজের সর্বস্ব অপরের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে ত্যাগের আনন্দ গ্রহণের মাস রমজান। মোটকথা এ মাস ভোগের নয় ত্যাগের। আর এই কঠোর ত্যাগ ও সংযমের মাধ্যমে মনকে পরিশুদ্ধ করার পর পুনঃরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার দিনটিকে বলে ঈদুল ফিতর অর্থাৎ (রোযা) ভাঙ্গার উৎসব। এদিন মুসলমানদের আনন্দের দিন। কিন্তু এ আনন্দের পরিসীমা কতখানি হবে তা' রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবীগণ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে আমাদের জন্য নির্দেশনা রেখে গেছেন। সাহাবীগণ এবং রাসূল (সাঃ) পুরো রমযানে খুব কম খাওয়া-দাওয়া করতেন। এজন্য তখন বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বছরের অন্যান্য সময় অপেক্ষা কম থাকত। ঈদের দিন রাসূল (সাঃ) মিষ্টি খেতেন এবং অন্যকে খাওয়াতেন। সাহাবীগণ এ সময় গাছ থেকে নতুন কাটা খেজুর, কিছু মিষ্টি এবং হালুয়া খেয়ে ঈদ পালন করতেন। ঈদের দিনে রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণও তাঁদের নিজস্ব জামা-কাপড়ের মধ্যে সবচেয়ে ভাল এবং সুন্দর জামা কাপড় পরে ঈদের জামাতে উপস্থিত হতেন। তাঁরা রমযান মাসের অধিকাংশ সময় টাকা নিয়ে মসজিদে অভাবগ্রস্থদের অপেক্ষায় বসে থাকতেন এবং ভাল কাজে কে কত বেশী নিজের সম্পদ ব্যয় করতে পারে তার একটা প্রতিযোগিতা লেগে থাকত তাদের মধ্যে। মোটকথা, এটাই হল রমযান ও ঈদ উৎযাপন করার রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমাদের সমাজে ঈদের সেই উত্তম আদর্শের ছিটেফোটাও অবশিষ্ট আছে কি?

জোর গলায় বলা যায়, মোটে নেই। এখনকার রমযান-ঈদ ত্যাগের পরিবর্তে ভোগের উৎসবে পরিণত হয়েছে। কোরবানীর ঈদের উদ্দেশ্য হল মানুষের পশু প্রবৃত্তিকে কোরবাণী করা। অথচ আমরা কে কত বেশী মূল্যের পশু কোরবানী করতে পারি সে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠি ঈদুল আযহার দিনে। রমযানে কম খাওয়াতো দূরের কথা বেলা দ্বিপ্রহরের পর পরই গৃহের কত্রীদের ডজন ডজন আইটেমের ইফতারী তৈরীতে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। রমযান মাসে আমাদের ভোজন বিলাস এত চরমে ওঠে যে, বাজারে দ্রব্যসমূহ অগ্নিমূল্যে বিক্রি হয়। রমযানে খাওয়ার পরিমাণ কম হওয়ার কারণে শরীরের সকল রোগ দূর হওয়ার কথা থাকলেও অতি ভোজনের ঠ্যালায় আমাদের দেহে নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি হয়। ডাক্তারের ঔষধের পুরো ডিসপেনসারী গিলে খেলেও সে রোগ সারতে চায় না। ঈদের দিনে তো কথাই নেই-মাশাআল্লাহ্। এ দিন কোর্মা-পোলাও, রোষ্ট, রেজালা, কালিয়া, কোপ্তা, বিরানী, খিচুরী, জর্দা, ফিরনি হাজার রকমের সেমাই হালুয়া খেয়ে পেটের যন্ত্রণায় মরণ এসে সামনে দাড়ায়।

রাসূল (সাঃ) ঈদের দিন যে ভালো-জামা কাপড় পরতেন সে সুন্নতের চরম বিকৃতি ঘটেছে আমাদের পোশাক বিলাসে। পাঁচ/ছয় হাজার টাকার বেতনের অফিসার আমলা লাখ টাকা খরচ করে ঈদের বজার করতে যান হংকং, সিঙ্গাপুর, বোম্বে। নইলে তাদের নাকি পেজটিজ নষ্ট হয়। তারা অবৈধ টাকা খরচ করার একটা রাস্তা বানিয়ে নিয়েছেন আর কি।

আমাদের দেশের অভিজাত অনভিজাত মার্কেট বা ফুটপাতের দোকান গুলির অবস্থা ঈদ মওসুমে খুবই অস্বস্তিকর রূপ ধারণ করে। আমাদের সোনামনিদের হিরিক পড়ে যায় নতুন নতুন ফ্যাশন খোঁজার। ছেলেরা শার্টের বোতাম খুলে উদোম বুক প্রদর্শন করে নিজেদের বাহাদুরী প্রকাশ করে আর ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, আমলা অফিসার পত্নী ও তাদের আদুরে কন্যারা উদোম মাথা, আধা খোলা বুক আর খোলা পেট প্রদর্শন করে নিজেরা তৃপ্ত হন অন্যের কামুক চক্ষুকেও তৃপ্তি দেন। ঈদের মার্কেটে এরাই একটা প্রথম শ্রেণীর পণ্যে পরিণত হয়। ঈদের বাজার প্রমাণ করে, আমাদের সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি যতই আর্থিক উন্নতি করতে থাকে ততই তাদের পত্নী ও কন্যাদের চেহারা-সৌন্দর্য একটা সস্তা পণ্যে পরিণত হয়। বছরের অন্যান্য সময়ের কথা না হয় বাদ দিলাম। পবিত্র রমযান মাসে এবং ঈদের দিনেও সুন্নতের বিকৃতি ঘটিয়ে, ফরজ ইবাদত পর্দাকে ড্যাম কেয়ার করে, ব্লাউজ, কামিজের কাটিংয়ে ইংরেজী 'ভী' অক্ষরের সার্থক রূপায়ন ঘটিয়ে প্রজাপতির মত পর-পুরুষের সামনে নিজেদের সৌন্দর্যের ডালা মেলে না ধরতে পারলে তারা তৃপ্তি পান না। ঈদের দিন উগ্র মেকাপ চর্চিত, ঝলমলে পোষাকে আর বিদেশী পারফিউমের প্লাষ্টার লাগনো রেখা, শ্রীদেবী, এলিজাবেথ টেইলার আর সোফিয়া লরেনদের ভীর জমে নগরীর অলিতে-

গলিতে। বিবেকবান মানুষের তখন হয় মরণ দশা। সামনের দিনগুলোতে রাস্তায় বেরুতে হলে তাদের চোখে ঠুলি পরতে হবে। এ অবস্থা চলতে থাকলে এক সময় হয়ত তাদের ঈদের দিন স্বগৃহে বন্দী থাকতে হবে নতুবা রাজপথে বেরুতে হবে বোরকা পরে।

কিন্তু এ অধঃপতনের জন্য দায়ী কে? এর জন্য দায়ী আমরাই। আমরা মদীনার ইসলাম এবং রাসূল (সাঃ)–এর আদর্শ থেকে সরে এসেছি বহু যোজন দূরে। আমরা আকরে ধরে আছি বাগদাদী, মোঘলাই, তুর্কী, দামেস্কী মুসলিম নামধারী বিলাসী রাজা–বাদশাহদের কর্মকাণ্ড ও জীবনাচারকে। ওই সব রাজ বংশের অধিকাংশ বাদশাই ইসলামের অনুশাসনে ইচ্ছেমত বিকৃতি ঘটিয়ে ইসলামী উৎসবগুলোকে ভোজন–বিলাসী কৃত্রিম অনুষ্ঠানে পরিণত করেছিল। মদ–আর বাঈজীর নাচ, নুপুরের ঝংকার আর তবলার তালে সারাক্ষণ ডুবে থাকতো বলে ওদের মস্তিষ্ক ছিল এক একটা মস্ত বড় শয়তানের আড্ডা।

এবারের ঈদ উপলক্ষে জনৈক সরকারী মন্ত্রী ঢাক–ঢোল–কাশা পিটিয়ে রাজপথে যে জমকালো উৎসব মিছিলের আয়োজন করেছিলেন তার উৎপত্তি ঘটেছিল ঐ শয়তানদের প্রভাবিত মস্তৃষ্ক থেকেই। আমরা হরেক রকমের খাদ্য ও পোষাকের সমারোহ ঘটিয়ে যে ঈদ উৎসব উদ্‌যাপন করি তাও আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি ওদের নিকট থেকেই।

সুতরাং আমাদের সমাজে ভোজন–বিলাস, লজ্জা–শরম ও পর্দাকে উপেক্ষা করে ঈদ উৎযাপন করার যে রেওয়াজ চালু হয়ে গেছে তাকে চিরতরে মুছে ফেলতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে ঈদের ত্যাগের আদর্শ। সমাজে ইনসাফ ভিত্তিক আইন ইসলামকে পুনোরুজ্জীবিত করতে হবে। নেই কি কোন সাম্য ও ইনসাফের সৈনিক যিনি বাধার হিমালয়কেও টপকে এ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন দৃঢ় চিত্তে?

শকুনের ন্যায় এক পাল মানুষ শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কার্যোপলক্ষে প্রায়ই এফডিসির পাশ থেকে আশা যাওয়া করতে হয়। সকাল–বিকেল, রাত্র–দুপুর সর্বদাই দেখি বখাটে টাইপের বস্তির বাসিন্দা, কিছু রিকশাওয়ালা এবং তাদের সাথে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারের দু'একটি কিশোর যুবকও শ্যেন দৃষ্টিতে এফডিসির বিশাল লোহার গেটের প্রতি তাকিয়ে আছে। কখন খুলবে এই গেট, কখন কোন নায়ক–নায়িকা বেরিয়ে আসবে—তাদের এক নজর দেখে চোখ জুড়াবে সেজন্য তাদের এই প্রতীক্ষা।

হ্যাঁ আমাদের সিনেমার রঙীন জগতের ধরার বুকের তারকা তথা নায়ক–নায়িকা, নর্তক–নর্তকী, গায়ক গায়িকাদের কথাই বলছি। যারা মাটির মানুষ হয়েও এক শ্রেণীর নির্বোধ মানুষের মনে দেবতার আসন গড়েছেন। ঐ শ্রেণীর মানুষ এদের এক নজর দেখলে তাদের মনে শান্তির ধারা অঝোর ধারায় ঝরতে থাকে। স্কুলে পড়ার অবসরে, খেলার মাঠে, আড্ডায় এদের নিয়ে জমজমাট রসালো গল্পের অবতারণা ঘটে। পর্ণো পত্রিকাওয়ালারা এদের বাহারী ছবি ছাপিয়ে হাতিয়ে নেয় প্রচুর মুনাফা। তথাকথিত আধুনিক ও প্রগতির সন্তানদের কাছে এরা হয়ে ওঠেন প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

আধুনিক এই সবাক সিনেমা আবিস্কারের কীর্তির দাবীদার ওয়ারনার নামক এক মার্কিন ইহুদী বিজ্ঞানী। ১৯২৭ সালে তিনি তার এই মহান (!) সৃষ্টিকে উপহার দিয়ে পৃথিবীর ভোগ বিলাসী মানুষদের চিত্ত বিনোদনের জগতে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটান। ভোগ লিপ্সু মানুষদের শুকিয়ে চৌচির হয়ে যাওয়া চিত্তে এ অনুপম আনন্দ রসের যোগান দিয়ে তিনি তাদের সকলের রাজকীয় শ্রদ্ধার পাত্র হন।

মূলতঃ সিনেমা আবিষ্কারের পেছনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সকল মানব জাতির নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করা। বিংশ শতাব্দীতে ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইহুদীরা কখনো পৃথিবীর কোথাও রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল না। পৃথিবীর জনসংখ্যার তুলনায় ইহুদীদের সংখ্যা খুব নগণ্য থাকায় তা সম্ভবপরও ছিল না। সংখ্যায় নগণ্য হলেও ইহুদীরা ছিল সকল সম্প্রদায়ের মানুষের ঘোর দুশমন। ধূর্তামী, ষড়যন্ত্র ও গণ্ডগোল পাকানোতে এই সম্প্রদায় সম্রাট হওয়ায় সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কতৃক মদীনা রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কৃত হয়। পরে ১২৯০ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে. ১৩০৬ ও ১৩৯৪ সালে—দুই পর্যায়ে ফ্রান্স থেকে, ১৩৭০ সালে বেলজিয়াম থেকে, ১৩৮০ সালে চেকোস্লাভিকিয়া থেকে, ১৪৪৪ সালে হল্যাণ্ড থেকে, ১৫৪০ সালে ইতালী থেকে, ১৫১০ সালে রাশিয়া থেকে, ১৫৫১ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হিটলার কর্তৃক জার্মানী থেকে এই একই কারণে এদের বহিস্কার করা হয়। সারা বিশ্ব থেকে এভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর অষ্ট্রিয় ইহুদী সাংবাদিক থিওডোর হাজেল আন্তর্জাতিক ইহুদী সংস্থা গঠন করেন। তার উদ্যোগে ১৯০৫ সালে সুইজারল্যাণ্ডে আন্তর্জাতিক ইহুদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে বিশ্বে ইহুদীদের কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য যে প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয় তার মধ্যে অন্যতম ছিল, "সর্বত্র আমাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বিশ্বব্যাপী মানুষের নৈতিক চরিত্রে ভাঙ্গণ ও বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে।"

এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য ইহুদী পণ্ডিতরা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে নাইট ক্লাব, বার, প্রমোদ তরী, সিনেমা, ভিসিয়ার, ব্লুফ্লিম, বিমান বালা, বিউটি পার্লার, কলগার্ল, মডেলিং আরও হরেক রকমের উদ্দ্যম চিত্তবিনোদনের উপায়–উপকরণ, প্রক্রিয়া। বিশ্বের প্রতিটি দেশের মত আমাদের দেশেও বৃটিশ শাসক এবং পরবর্তিতে তাদের তকমা আটা শাসকদের সুবাদে এবং চিত্ত হরণকারী বিচিত্র উপায়

উপকরণ সুড় সুড় করে ঢুকে পড়ে। এক সময় সিনেমা হয়ে ওঠে বাংলার তথাকথিত ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতি, অবিচ্ছেদ্য অংশ। নায়ক-নায়িকারা বুক ফুলিয়ে জোড় গলায় দাবী করতে থাকেন, 'সিনেমা সুস্থ বিবেকবান সমাজ গঠনের হাতিয়ার।' আর যেহেতু তাঁরাই এই মহৎ কর্মটির আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। সেহেতু তারাই মহান (!)

ইতরামী আর বাদরামী যাদের আজীবনের সাধনা এক পর্যায়ে তারা সমাজ সংস্কারের মহৎ ভুমিকায় অবতীর্ণ হন। লজ্জা নামক মানবীয় গুণটাকে জলাঞ্জলি দিয়ে রূপালী জগতের সোনালী মানব-মানবীরা মেতে ওঠে রোমান্টিক চিত্তহরণকারী বিচিত্র কর্মকাণ্ডে। এই জগতের বাবা মেয়েকে, ভাই বোনকে, স্বামী স্ত্রীকে পরপুরুষেল সাথে অভিনয়নের নামে জড়াজড়ি, ঢলাঢলি, কোলাকুলি করার সুযোগ করে দেন। এসব দৃশ্য দেখে তাদেরকে আরো এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দেন, চমৎকার অভিনয় হচ্ছে বলে নিজেরা আনন্দে বাক-বাকুম করতে থাকেন। দর্শকদের কাতারে বসে অদূরের দুলারীর শরীর নাচানো বাহারী নৃত্য দেখে তারাও হাততালি দিয়ে বাহবা জানাতে কসুর করেন না।

রোমান্টিক মানব মানবীরাও ভদ্র প্রগতিবাদী পিতা, ভাই, স্বামীর এই উদারতা, অকৃত্রিম প্রেরণার মূল্য দিতে ভুল করেন না। লাইম লাইটে উঠে আসার জন্য বিচিত্র এবং শিহরণমূলক নানান রোমান্টিক ঘটনা ঘটানোর একটা প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে লেগেই থাকে। কে কতখানি বিউটি কুইন সাজতে পারে, প্রেম নিবেদনে কে বেশী পারঙ্গম, কে দেহ প্রদর্শনী করতে বেশী উদার এসব যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় এই মহান (!) সাংস্কৃতিক অঙ্গণে কে বেশী প্রতিভাবান ও কুশলী সাংস্কৃতিক কর্মী। জাতীয় সংস্কৃতিতে তার এই অসামান্য অবদানের জন্য তার কোচরে একের পর এক রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক পুরস্কার আসতে থাকে। ওনারা চলনে বলনে স্বপনে নিজেদের সংস্কৃতির জনক জননী কল্পনা করে আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করেন। স্টুডিও পাড়া, পার্টিতে, আড্ডায়, মনের মত সাংবাদিক পেলে পুচ্ছ নাড়তে নাড়তে মনের এ কথাগুলোই ঢেলে দেন।

সুস্থ বিবেকবান মানুষকে অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেহায়াপনা ও পশুত্বের দিকে প্রতিনিয়ত আহবান করা যাদের মহান ব্রত সেই শয়তানের দোসররা চলনে-বলনে যতই সাধু সাজার অপচেষ্টা চালাক ওরা কখনই মানবতার বন্ধু নয়। শয়তান সর্বদা বহুরূপী, সে সর্বদাই নিজেকে সাধু বলে জাহির করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে।

সিনেমার রূপালী জগতের নট-নটীরাও শয়তানের চেয়ে কোন অংশে কম নয় বরং ওদের কার্যকলাপ দেখে শয়তানও লজ্জায় মুখ লুকায়। এই জগতে নৈতিকতা বা মানবীয় কোন গুণাবলীর বালাই নেই। সংস্কৃতি সেবার নামে যে সমস্ত দৃশ্যের ওরা অবতারণা করে মনে হয় যেন ওরা অ-তমানব। অথবা মানবীয় সকল রীতি-নীতি, সীমা-পরিসীমার জঞ্জাল (!) থেকে ওনারা মুক্ত। প্রকৃতি ওনাদের অবাধে জড়াজড়ি, ঢলাঢলি করার মহা সনদ দিয়ে দিয়েছে। জগতে ওনাদের আবির্ভাব, ওনাদের মিশনই হল মানুষের চিত্তহরণ করা, নব-নব সুখে তাদের মন হৃদয়কে ভরিয়ে দেয়া।

যুগের হাওয়া, আধুনিকতা, প্রগতি, নারী স্বাধীনতা ও সভ্যতার নামে অশ্লিলতা, নগ্নতা ও চরিত্রহীনতার জোয়ারে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়া পাশ্চাত্যের ধর্মকে বিকৃতিকারী ইহুদী খৃষ্টান নর-নারীর জাত আসলাত। ওই সমাজের পুরুষেরা কন্যা-বোন-স্ত্রীকে নাচিয়ে অন্যকে তাদের ফর্সা উরু, নিতম্ব ও শরীরের লোভনীয় অংশ দেখিয়ে ও নিজেরা দেখে সুখ পায়। নিজেদের শরীরে লম্বা প্যান্ট, ঢোলা সার্ট চাপালেও রমনীকূলকে মিনি স্কাট, বিকিনি, আটো সাঁটো সংক্ষিপ্ত পোশাক পরিয়ে রাস্তায়, ক্লাবে, বারে, থিয়েটারে, সিনেমায় যত্রতত্র ছেড়ে দিয়ে নিজেরা চিত্তকে শীতল করে অন্যের চিত্তেও শান্তি বিলায়। নারীকে চিত্তবিনোদনের জন্য যত প্রকারে পারা যায় পণ্য সামগ্রীর মত ভোগ করাই ওদের সংস্কৃতি। যৌনতা ও নারী দেহের পূঁজো করা ওদের প্রগতি নারীকে পরিবারের বাঁধন থেকে বেড় করে যতখানি সম্ভব সংক্ষিপ্ত বসনে অফিসে, আদালতে, বাসে-ট্রেনে, শহরে-নগরে সর্বত্র নিজেদের চাওয়া পাওয়ার চৌহদ্দিতে হাজির রাখাকে ওদের ভাষায় নারী স্বাধীনতা বলে। ওই সমাজের সিনেমা ও টেলিভিশন এসব নগ্নতা, অশ্লিলতাকে প্রগতি আর নারী স্বাধীনতার মোহরাঙ্কিত করে প্রচার করতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। তাই দেখা যায়, ম্যাডোনার ব্যবহৃত পোশাক নিলামে ওঠে, তিনি কনসার্টে রিতিমত বস্ত্রের জঞ্জাল মুক্ত হতে পারেন বলে তার এত বিশ্বখ্যাতি। হলিউড, বোম্বের নায়িকারাতো রীতিমত প্রতিযোগিতায় মেতে থাকে কে কত সংক্ষিপ্ত বসনে নিজেকে উপস্থাপন করে অধিক দর্শক প্রিয় হতে পারে। পত্রিকায় ফলাও করে সাক্ষাৎকার ছাপানো হয়, দর্শকদের রুচির প্রয়োজনে নিজেদের আরো খোলামেলা হয়ে ক্যামেরার সামনে দাড়াতে তাদের কোন আপত্তি নেই।"

পাশ্চাত্যের ভ্রষ্ট সমাজের এই সমস্ত নীতিহীন কর্মকাণ্ড এই মুসলিম দেশটিতেও অবাধে চলছে। রূপ-সৌন্দর্য, ভাড়ামী পূর্ণ হাসি, মিষ্টি কণ্ঠস্বর ও যৌবন নাকি এই জগতে খ্যাতির শীর্ষে ওঠার মুলধন। যে যত এগুলিতে পারদর্শী হবে সে ততই দ্রুত সাফল্যের চূড়ায় চড়ে পা দোলাতে পারবে। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, লজ্জা নৈতিকতা এদের কাছে পচা পান্তা ভাত। ধর্মীয় বিধি বিধানের সীমাকে ওরা অহরহ ভেঙ্গে ফেলে সমাজকে উপহার দিচ্ছে, লজ্জাহীনতা, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, নিত্য নতুন ফ্যাশন, বিলাস দ্রব্যের

আহরণ, পারকিয়া প্রেম, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীর মহা পবিত্র ও স্বর্গীয় প্রেমের (?) নামে অবৈধ সম্পর্ক গড়ার সবক এবং কলাকৌশল।

ইসলাম নারীদের বেআব্রু হয়ে চলা-ফেরা করতে নিষেধ করেছে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে। কিন্তু রুপালী জগতের নটীরা তা' উপেক্ষা করে বেআব্রু কেন বিবস্ত্র হতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইসলাম নারীদের মর্যাদা রক্ষার এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট ১৪ জন পুরুষ ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য পুরুষের নিকট থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু ওনারা চিত্ত বিনোদনের বাজারে যেভাবে পণ্যের মত ব্যবহৃত হন, নিজের সুন্দর দেহ বল্লরী সৌন্দর্যকে বিক্রি করে গাড়ী, বাড়ী, টাকার পিছনে হন্যে হয়ে ছোটেন এবং অন্যকে তাদের পথ অনুসরণ করার উৎসাহ দেন তাতে মনে হয় যেন এই পৃথিবীতে যত নীতি-নিয়ম, নৈতিকতা, ধর্মীয় বিধান আছে সেগুলোকে দুমরে - মুছরে একাকার করে দেয়ার জন্যই ওনাদের জন্ম হয়েছে। ধর্মের বিরুদ্ধে, নৈতিকতার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করাই ওনাদের জীবনের সাধনা। ধর্মের কথা শুনলে ওরা হাসে-দাঁত বের করে হাসে। পারলে মুখের ওপর বলে দেয়, "ওসব নীতি আদর্শের ফাঁকা বুলিতে সমাজ-দেশ চলে না, ওতে ভাত জোটে না, ওপথে অর্থ নেই, যশ নেই, খ্যাতি নেই, সম্মান নেই।"

এদের নিয়ে আমাদেরও তত মাথা ব্যথা নেই। ওরা নাচছে আরও নাচুক, প্রকৃতি প্রদত্ত দেহখানা ষোল আনাই প্রদর্শন করে আরও বাহবা কুড়াক ওরা ওদের কিছিমের লোকদের "খেমটা' নাচের তালে তালে আরও দিওয়ানা করুক, ছাগল-পাগল বানিয়ে ছারুক তাতেও আমাদের কিছু আসে যায় না। ওদের মা-বোন-স্ত্রীদের ইজ্জতের না হয় কোন মূল্য নেই, বরং তাদের ইজ্জত বিকিয়ে, পরের মনোরঞ্জন করে তারা মূল্যবান বাড়ী-গাড়ি করে তৃপ্তি পায়। পরপুরুষের সাথে যেমন খুশি তেমন সম্পর্ক রাখলেও তাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু এই সর্বনাশা ও ধ্বংসাত্মক অভিশাপটা গোটা জাতির ওপর চাপিয়ে দেয়ার অধিকার ওরা কোথায় পেল? জনসমক্ষে পাগল-ছাগলের বেশ ধারণ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার এত আয়োজন কেন? ধর্মীয় মূল্যবো-ধের ওপর এত আঘাত কেন? এরকি কোন প্রতিকার নেই?

রুখতে হবে এই শয়তানী, গুড়িয়ে দিতে হবে শয়তানদের আড্ডা খানা। সমাজকে মুক্ত করতে হবে এইসব শয়তানদের বদ আছর থেকে। ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে হাসি-ঠাট্টাকারীদের রুখতেই হবে। ওদের অশুভ তৎপরতায় বিভ্রান্ত মানুষদের জানিয়ে দিতে হবে যে, সিনেমা আর হিরো-হিরোইনদের অশ্লীলতা সুস্থ সমাজ গঠনের হাতিয়ার নয়। মানবতা, শালীনতা, নৈতিকতা ও বিলাসীতা মুক্ত জীবন যাপন ও অন্যকে সে পথ অনুসরণ করার আহবান এবং এ জাতীয় তৎপরতাই হতে পারে সুস্থ সমাজ গঠনের হাতিয়ার। প্রকৃতি প্রদত্ত রুপশ্রী এবং দেহকে পুঁজি করে কোন ব্যবসা করা ও জীবিকা নির্বাহ করার পাথেয় করে নেয়া বৈধ তো নয়ই মানবিক দৃষ্টিতেও চরম ঘৃণিত কারবার। ইসলামের ফয়সালা তো আরো কঠিন। এ সত্যটুকু বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী এবং বিভ্রান্তের শিকার উভয় শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌছে দিতে হবে। কে আছো ভাই সত্যের সাধক, সত্যের ঝাণ্ডাধারী! বিভ্রান্ত মানুষের কাছে সত্যের আলো কে পৌছিয়ে দিবে, কে সবদিকে জ্বালাবে সত্যের মশাল?

প্রশ্নোত্তর

(৩৪পৃঃ পর)

বেশী বলা হয়েছে জিহাদর কথা। সে সব আয়াতের অধিকাং স্থানে জিহাদ দ্বারা নফসের জিহাদকে বুঝান হয়নি। বুঝান হয়েছে ইসলাম বিরোধীদের মুকাবিলায় অস্ত্রহাতে সরাসরি ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার কথা। কুরআন ও হাদীসেরর পরিভাষায় জিহাদ বলতে কাফিরদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের করার কথাই বুঝায়। এছাড়া অন্য কিছুকে অন্ততঃ কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয় না। তাই আকবর ও আসগারের প্রশ্নই উঠে না। জিহাদ বলতে বহু বিষয়কে যদি বুঝাত তাহলে তুলনা করার অবকাশ ছিল যে, কোনটি চোট এবং কোনটি বড়। জিহাদ বলতে যেহেতু উপরোক্ত একটি বিষয় ছাড়া দ্বিতীয় কিছু বুঝায় না সেহেতু কোনটি ছোট এবং কোনটি বড় তা তুলনা করার অবকাশ কই?

তবে শাব্দিক ভাবে যুদ্ধ ছাড়াও সংগ্রাম, সাধনা অর্থেও জিহাদ ব্যবহৃত হয়। তাই যেহেতু নফসের সাথে সংগ্রাম করে দ্বীনের পথে চলতে হয়, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে হয় তাই শাব্দিক অর্থে একেও জেহাদ বলা যায় এবং বলা হয়ও! তবেতো কখনও জিহাদে আকবর নয়।

জাগো মুজাহিদ
পড়ুন
নিয়মিত
বিজ্ঞাপন
দিন।

কমাণ্ডার আমজাদ বেলাল

আল্লাহ্‌র সাহায্য

আমি স্বচক্ষে দেখেছি

প্রথম ক্রেক ডাউনের পরও আমি এই গ্রামে রয়েছি এ খবর ভারতীয় সৈন্যরা জানতে পেরে দু'দিন পর পুনরায় গ্রামে ক্রেকডাউন করে। এবার তারা রাত সাড়ে বারটায় গ্রাম ঘিরে ফেলে। পাঁচ হাজার ফৌজের এক বড় গ্রুপ এই তল্লাশীর অভিযানে অংশ নেয়। রাত দুটার সময় আমার কাছে ক্রেক ডাউনের খবর পৌঁছে। তখন গ্রাম থেকে বের হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কোন উপায় না দেখে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে থাকি। এর মধ্যে আমার সেই কাশ্মিরী দু'বোন এসে হাজির। শলাপরা-মর্শের পর তারা বল্লেন, আমাদের ঘরের এক পাশে ঘাসের স্তুপ রয়েছে তার মধ্যে লুকানো ছাড়া এখন আত্ম রক্ষার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

অন্য কোন উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত তাদের পরামর্শে রাজী হলাম। তারা দুবোনে অনেক যত্নসহকারে এক পাশের ঘাস সরিয়ে আমাকে তার মধ্যে রেখে পুনরায় ঘাস পূর্বের মত সাজিয়ে রাখে।

ভোরে সৈন্যরা গ্রামে প্রবেশ করে। ঘরে ঘরে তল্লাশী চালায়। যেখানে যা' পায় ভেংগে চুরমার করে ফেলে এবং মূল্যবান জিনিসগুলো তুলে নেয় এবং কোন কোন জিনিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। অবশেষে তাদের একটা গ্রুপ ঘাসের স্তুপের কাছে এসে দাড়ায়। একজন সৈন্য অফিসারকে লক্ষ্য করে বল্লো, স্যার! এই ঘাসের স্তুপে তল্লাশী নিয়ে দেখবো? অফিসার ধমক দিয়ে বল্লো, "এর মধ্যে কিছুই নেই। প্রথম প্রথম (দুসকৃতকারীরা) এ সবের মধ্যে অস্ত্রপাতি লুকিয়ে রাখতো। আমরা তা টের পেয়ে এতে আগুন লাগাতে থাকি। এখন সাবধান হয়ে গেছে। এখন ওরা এর মধ্যে কিছুই রাখে না।" তবুও স্যার একটু দেখে নেই? অনুরোধের সুরে সিপাহী অফিসারকে বল্লো। এবার বিরক্ত হয়ে অফিসারটি পকেটের দিয়াশলাইটি হাতে তুলে দিয়ে বল্লো। "যাও আগুন ধরিয়ে দাও।"

তাদের কথপোকথন আমি কান লাগিয়ে শুনছিলাম। বোল্ড করা ক্লাসিনকভ আমার হাতেই ছিল। এক লাফে বের হয়ে কয়েকজন সৈন্যকে জাহান্নামে পাঠানো আমার পক্ষে অতি সহজ। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র গ্রাম ধ্বংসস্তুপে পরিণত হত। তাই তা করলাম না। সৈন্যটি স্তুপের এক পাশে দাড়িয়ে দিয়াশলাই জ্বালানোর চেষ্টা করছে। আমার মনে হল, স্তুপের ওপাশে আগুন লেগে গেছে। এবার সে অন্য পাশে দাড়িয়ে ম্যাচের কাঠি ঘষছে। মনে মনে ধারণা করলাম, সে একসাথে দুপাশে দিয়ে আগুন লাগাতে চাচ্ছে যাতে তাড়াতাড়ি এটি জ্বলে শেষ হয়ে যায়। এর পর তৃতীয় কাঠি জ্বালাবারও আওয়াজ পেলাম। মনে মনে ভাবলাম, আগুন হয়ত আমার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এক লাফে বাইরে বেড়িয়ে এই দুই ইণ্ডিয়ানে প্রথমে জাহান্নামে পাঠাবো, তার পর যা হবার হবে। তৃতীয় কাঠি জ্বালাবার পর পরই অফিসারের কর্কস আওয়াজ শুনতে পেলাম। হারামখোর কোথাকার! একটা ম্যাচও জ্বালাতে পার না! সৈন্যটি বিনয়ের সাথে বল্লো, "স্যার! দিয়াশলাইর কাঠি জ্বলছে না, একটি কাঠি বাকী আছে। আপনি নিজ হাতে সেটা জ্বালান।" অফিসার রাগে গোস্বায় জ্বলতে জ্বলতে দিয়াশলাই হাত থেকে টেনে নিয়ে খোঁচা মারলো। আমিও এক লাফে বের হতে তৈরী হলাম। এমন সময় শব্দ পেলাম, অফিসার ম্যাচটিকে স্বজোরে নিচে ফেলে বুট দিয়ে পিষে দেয়। লজ্জায় গোস্বায় জ্বলতে জ্বলতে সেপাইকে বল্লোঃ "যাও, ঐ ঘর থেকে ম্যাচ নিয়ে আসো" ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন সৈন্য সেখানে এসে পৌঁছে। সারা ঘরের মালপত্র নিচে ফেলে দলাই করছে। কিন্তু কোথাও ম্যাচ খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ ম্যাচ তাদের চোখের সামনে চুলার পাশেই রাখা ছিলো। আল্লাহ্ তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন তাই দিবালোকেও ম্যাচ খুঁজে পেলো না। ইতিমধ্যে অফিসার ডাক পারলো, "আমি বলেছিলাম না, এর মধ্যে কিছু নেই। খামাখা সময় নষ্ট করছো।" একথা শোনার পর সৈন্যরা ফিরে যায়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা করার মত ভাষা আমার নেই। তিনি ভাষার মোহতাজ নন, হৃদয়ের আবেগই তার জন্য যথেষ্ট।

সমস্ত আবেগ সহ তার কাছে দোয়া করলাম। গাড়ী চলার শব্দ শুনতে পেলাম। ইন্ডিয়ান সৈন্যরা ক্রেক ডাউন তুলে ফিরে যাচ্ছে। তারা যাওয়ার পূর্বে গ্রামের মেয়েদের সাথে এমন অশালীন আচারণ করেছে যা বর্ণনা দিতেও লজ্জাবোধ হয়।

সৈন্যরা চলে যেতেই আমার দু'বোন এসে ঘাস থেকে আমাকে বের করলো। আমাকে দেখে তারা আনন্দে কাঁদতে লাগলো। তাদের সশব্দ কান্না দেখে আমি হতবাক হলাম এবং আমি বেঁচে যাওয়ায় তারা যে মহব্বত ও আনন্দ প্রকাশ করলো তাতে লজ্জিত না হয়ে পারলাম না। আমি বার বার ভাবতে লাগলাম, এরা আমাদের কাছে কত বড় আশা রাখে। অথচ আমরা কত গাফেল। তাদের আজাদীর জন্য আমরা কতটুকু কি করতে পারছি। দেখতে দেখতে গ্রামের সকল লোক এসে আমার চার পাশে

জড়ো হয়। পুরুষ-মহিলা, বৃদ্ধ-শিশু সবার চোখ থেকে খুশিতে আনন্দাশ্রু বের হচ্ছে। আমি নিরাপদে বেঁচে যাওয়ার জন্য তারা একে অপরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছে। জানতে পারলাম, য়েরাওয়ের সময় কয়েকজন মহিলা একাধারে নামাজ পড়ে আমার জন্য দোয়া করেছে। আমাকে জীবিত ও সুস্থ দেখে তাদের আনন্দের কথা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এই গ্রামে আমি এগারো দিন ছিলাম। বার বার ক্রেক ডাউন হওয়ায় রাতে গ্রামে থাকা ঠিক নয় ভেবে দিনের বেলা গ্রামে কাটিয়ে রাতে পাহাড়ে চলে যেতাম। আমার সাথে গ্রামের তিনটি কিশোর রাত কাটাতে পাহাড়ে যেতো। তারা মোর্চা খুড়ে সেখানে আমাকে ঘুম পাড়াতো ও নিজেরা পালা করে পাহাড়া দিত। তাদের জিহাদী জজবা ও ভারতের প্রতি প্রবল ঘৃণা দেখে আমি আশ্চার্য্যান্বিত হতাম। আমার কাছে একটি ক্লাসিনকভ ও দুটি পিস্তল ছিল। তারা ক্লাসিন কভ ও পিস্তল নিয়ে মোর্চার আসে পাশে পাহারা দিত আর আমি নিরাপদে ঘুমাতাম। তারা আমার কাছে অস্ত্রের ট্রেনিং নিত এবং সর্বদা বলতো, কাশ্মীর আমাদের, আমরা মুসলমান, আমরা কাশ্মীরের আজাদী ছিনিয়ে আনবোই। আমার কারণে এই গ্রামে দুই বার ক্রেক ডাউন হয়েছে। আবারও হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ভারতীয়রা আফগান মুজাহিদদের যমের মত ভয় করে। আর করবেই বা না কেন? তাদের আদর্শিক গুরু রুশদের নাকানিচুবানি খাইয়েছে এই শক্ত পেশী ও ইস্পাত কঠিন ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান আফগানীরা। অতএব যত দিন তারা গ্রামে কোন আফগান মুজাহিদদের অবস্থানের কথা শুনবে ততদিন ক্রেক ডাউন চলতে থাকবে।

আমি অন্যত্র চলে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করতে লাগলাম। এই কথা দুই একজনের কাছে প্রকাশ করতেই গ্রামের সকল লোক আমার নিকট এসে অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলো, "আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না।" যদিও তারা আমার কোন যুদ্ধের প্রোগ্রাম দেখেনি। শুধু লোক মুখে আফগান মুজাহিদদের বীরত্বগাঁথা শুনে আমাকেও একজন বীর মুজাহিদ বলে ধারণা করে নিয়েছে। তারা বার বার বলতে থাকে, "আমরা বহুদিন ধরে হয়ত আপনারই প্রতিক্ষায় ছিলাম। আমরা এই আশা নিয়ে জিহাদ শুরু করেছি যে, আফগান ভাইরা এসে আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুলতান মাহমুদ ও আহম্মদ শাহ আবদালীর মত এই পবিত্র ভূমি থেকে মুর্তিপুজারী হিন্দুদের চিরতরে বিতাড়িত করবে। আজ আমরা আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি। এতদিন মুখে মুখে শুধু আফগানীদের কেরামতের কথা শুনেছি। এবার তা' চাক্ষুশ দেখলাম। আমরা গ্রামের সকলে শহীদ হয়ে যাব, নিজেদের সব কিছু কোরবান করে দিব, তবুও আপনার হেফাজতে বিন্দুমাত্র গাফলতী করব না। আপনি আমাদের এখানেই থাকুন। আমরা আশা করি, যতদিন আপনি এই গ্রামে থাকবেন ততদিন আল্লাহ্‌র রহমাত আমাদের উপর বর্ষিত হতে থাকবে।"

তাদের বারংবার অনুরোধে আমি এই গ্রামে থেকেই আমীর সাহেবের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু কোন প্রকার যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ায় অগত্যা গ্রাম ছেড়ে শ্রীনগর যাওয়ার প্রস্তুতি নেই।

গ্রামের সকল পুরুষ মহিলা আবাল বণিতা জড়ো হয়ে আমাকে 'আলবিদা' জানায়। তারা আমার সাথে সাথে গ্রাম থেকে দুই কিলোমিটার পথ দূর পর্যন্ত হেটে আসে। সকলের চোখে অশ্রু দেখে আমার চোখেও ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু জমা হয়। অনেক দুর পর্যন্ত আমার দুই বোন দোপাট্টা উড়িয়ে আমাকে বিদায় জানায় আর তাদের মা দুহাত উঁচু করে আল্লাহ্‌র কাছে আমার হেফাজতের জন্য দোয়া করতে থাকে। যে শিশুরা পাহাড়ে আমাকে পাহারা দিত বাস লাইন পর্যন্ত তারা আমার সাথে সাথে আসে। আমার সব কিছু গ্রামে রেখে শুধু ক্লাশিনকভ, পিস্তল, গ্রেনেড ও চাকু সাথে নিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে চললাম। ক্লানিস কভ কাঁধে ঝুলিয়ে তার উপর কাশ্মীরী আলখেল্লা পড়ে নিলাম। বাসে উঠার সময় কন্ট্রাক্টর আমাকে সহযোগিতা করতে যেয়ে হাত বাড়াল। তার হাতের নিচে ক্লাসিন কভ পড়ে। সে বিস্ময় হতবাগ হয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলো, "মৌলভী সাব আপনি কোথা থেকে এসেছেন এবং যাবেন কোথায়?" তার কাশ্মিরী ভাষার প্রশ্নের জবাবে আমি উর্দুতে বললাম, আমি শ্রীনগর যাব। সে বল্লো আপনি এ বাসে যেতে পারবেন না। আমি বল্লাম, কেন পারবো না? আমার ভাষা শুনে ও চেহারা সুরত দেখে সে ধারণা করেছে আমি কাশ্মিরী নই। আফগানী কিংবা পাকিস্তানী হব। আবার সে বল্লো, এখন পর্যন্ত কোন স্বশস্ত্র লোককে এই বাসে করে শ্রীনগর নেই নি। তাছাড়া এখান থেকে শহর পর্যন্ত দশটি চেক পোষ্ট আছে। প্রতিটি পোষ্টে তন্ন তন্ন করে তল্লাশী করা হয়। সকল যাত্রীকে নিচে নামিয়ে দেহ তল্লাশী করা হয়। আপনি কোন সাহসে এভাবে শ্রীনগর রওয়ানা করেছেন? যাত্রীদের মধ্যেও আমার বিষয়ে গুঞ্জন শুরু হয়। সবাই বললো, "আপনি এপথ সম্পর্কে খবর রাখেন না। নেমে যাওয়াই আপনার জন্য নিরাপদ"। তাদের মধ্য দিয়ে কেউ কেউ ধমকীও দিতে লাগলো। "ভালোয় ভালোয় নেমে পড় নইলে-----।"

আমিও রুঢ় ভাবে জবাব দিলাম, "নিজ নিজ সিটে চুপচাপ বসে থাকুন। আমার প্রাণ আমার নিকট কম প্রিয় নয়। কিছুই হবে না। ঠিকমত পৌছে যেতে পারবো।" আমার ধমকী ও অনভিজ্ঞতার কথা ভেবে তারা আস্তে আস্তে চুপ হয়ে যায়। আমি বল্লাম, "আমাকে যেতে দাও, পরে যা হবার হবে সেজন্য চিন্তা করি না।"

বাস ছাড়তেই আমি ছিটে বসে দুহাত তুলে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের কাছে মুনাজাত করতে লাগলাম, "হে খোদা! আমি তোমার রাস্তায় তোমার দ্বীনকে বিজয় করতে, লাঞ্ছিত মা বোনদের ইজ্জত রক্ষা করতে মাতৃভূমি ছেড়ে সুদূর প্রবাসে একাকী পথ চলছি। তুমিই আমার একমাত্র সহায়, আমাকে হেফাযত কর এবং নিরাপদ পথ প্রদর্শন কর। তুমি ছাড়া আমার দ্বিতীয় কোন সহায় ও সাহায্যকারী নেই।"

আমি কায়মনবাক্যে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করছি। বাস দ্রুত বেগে এগিয়ে চলছে। কন্ট্রাক্টরসহ সকল যাত্রী আমার ব্যাপারে আলোচনা-সমালোচনা করছে। ইতিপূর্বে আমি অনেকবার আল্লাহ্র সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছি। অতএব নিশ্চিন্ত মনে খোদাকে স্মরণ করতে লাগলাম।

আর মাত্র এক কিলোমিটার দূরে ইণ্ডিয়ান সৈন্যদের চেক পোষ্ট। যাত্রীদের চেহারা ভয় ও আতঙ্কে পাণ্ডর। একটু আগেও আবহাওয়া ছিল সুন্দর, আকাশও ছিলো পরিষ্কার। এরি মধ্যে হঠাৎ বরফপাত শুরু হয়। দেখতে না দেখতে সাদা বরফে সব ঢেকে যায়। শীত মওশুমের এটাই প্রথম বরফপাত। ইন্ডিয়ান সৈন্যরা রাস্তার ওপরে তাবু ফেলে রেখে নিরাপদ আশ্রয়ে কোথাও চলে গেছে। আমি বুঝতে পারলাম, আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হচ্ছে। বিনা তল্লাশিতে আমরা চেক পোষ্ট পার হলাম। প্রথম বাঁধা ভালোয় ভালোয় অতিক্রম করায় যাত্রীদের ঠোঁটে হাসির আভা ফুটে উঠে। তারা আমাকে নানা প্রশ্ন শুরু করলো। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? কোন সংগঠনের সাথে আপনার সম্পর্ক? ইত্যাদি। কন্ট্রাক্টর কাছে এসে বল্লো, "আজ পর্যন্ত এমন সাহসী মুজাহিদের দেখা পাই নি যে, অস্ত্র নিয়ে এভাবে নির্ভয়ে শ্রীনগর প্রবেশ করার সাহস পেয়েছে। আমি সকলকে বল্লাম, আল্লাহ্র সাহায্য আমাদের সাথে অবশ্যই আছে। আমরা সকলে নিরাপদে শ্রীনগর পৌছে যাব—ইনশাআল্লাহ।"

আল্লাহ্র অপার রহমতে শ্রীনগর পর্যন্ত পথের সকল পোষ্টের সৈন্যরা বরফপাতের জন্য রাস্তায় এসে তল্লাশী করার সুযোগ পায়নি। শ্রীনগর এসে বাস থেকে নেমে দেখলাম, চারিদিক সাদা বরফে ঢাকা।

আজমল নামক মুজাহিদের নাম ঠিকানা আমার জানা ছিল। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সেই দিকে রওয়ানা হলাম। পথে ড্রাইভার কাশ্মিরী ভাষায় আমাকে নানা কথা বলতে লাগলো। আমি সবকিছু না বুঝেও তার কথায় হাঁ না করে তাকে আমার ব্যাপারে আস্বস্ত করার চেষ্টা করি। মহল্লায় পৌছার পর সে আমার অস্ত্র দেখতে পেয়ে নিচে নেমে হেটে হেটে আমার কাছে এসে অনেক প্রশ্ন করতে থাকে। আমিও কোথার লোক, কোন সংগঠনের, কোথায় যাব ইত্যাদির ব্যাপারে সামান্য ধারণা দিয়ে তাকে বিদায় করে দেই।

বরফপাতের জন্য রাস্তা জন মানব শূন্য। চারিদিক নিরব নিস্তব্ধ। আমি সড়কের কিনারা ধরে একা একা হাটছি। এর মধ্যে একটি ফৌজি জীপ এসে আমার কাছে থামে। তারা আমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করতে থাকে। আমি সে দিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ না করে পথ চলতে থাকি। কিছুক্ষণ পর জীপটি তার পথধরে চলে যায়। এবার আরও একটা জীপ এসে আমাকে দেখে চলে গেলো। এরপর একটি সাঝোয়া গাড়ি আসার শব্দ পেলাম। সাঝোয়া গাড়ি সম্পর্কে শুনা যায়, এরা বিনা প্ররোচনায় লোকের শরীরের উপর দিয়ে চালিয়ে যায়। আমি রাস্তা ছেড়ে কিনারায় নেমে পড়লাম। বরফ পড়ে আমার কোর্ট টুপি সব সাদা হয়ে গেছে। তারা আর আমাকে দেখতে পেল না।

পথে কোন লোকজন নেই। কারো কাছে আজমলের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে না পেরে এক ঘরের দরজায় কড়া নাড়লাম। একটি বালিকা বের হয়ে বল্লো, "কাকে চান?" আমি বল্লাম, "আজমলকে, সে এই মহল্লায় থাকে।" আমি কাশ্মিরী ভাষা বলতে না পারায় সে মেয়েটি মনে মনে ভেবেছে, কোন পাহাড়ি এলাকা থেকে এসেছি। (কাশ্মির উপত্যকার বাহিরের অধিবাসীরা কাশ্মিরী ভাষা জানে না। তাদেরকে পাহাড়ী বলা হয়।) অতএব সে আমাকে আপদ মনে করে বল্লো, "এ পাড়ায় আজমল নামে কেউ থাকে না।" বলেই ঝট করে দরজাটা লাগিয়ে দিল। আমি ভাবতে লাগলাম, এখন কার কাছে কি জিজ্ঞাসা করি। সবার কাছে জিজ্ঞাসা করাও নিরাপদ নয়। পঞ্চাশ গজ দূরে যেয়ে একটি দেয়ালের আড়ালে দাড়িয়ে বরফ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করলাম। তবে ঐ বালিকাটি জানালা দিয়ে আমাকে দেখছিল। আমার অসহায়ত্ব দেখে তার দয়া হল। সে জানালা দিয়ে আমাকে কাছে ডাকে। কাছে আসলে জানতে চাইলো, কোন আজমল। সে কি কাজ করে? আমি তার কিছু বিবরণ দিতেই দরজা খুলে ঘরে বসতে দিল। এবার তার বড় বোন ও মা এসে আমার পাশে বসলো। গরম অঙ্গার এনে আমার কাছে রাখলো। ছোট বোন নুন চা এনে আমাকে পান করালো। একটু গরম হওয়ার পর বৃদ্ধা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমি কেন আজমলের কাছে এসেছি। আমি বললাম, তার সাথে ব্যক্তিগত কাজ আছে। শুধু মাত্র তাকেই বলা যাবে। বৃদ্ধা বল্লো, সে এখন এখানে নেই। ইন্ডিয়ায় গেছে। আমি বললাম, তার ঘর পর্যন্ত আমাকে পৌছে দিন। আমি সেখানে থেকে তার অপেক্ষা করবো। এরপর তার এক বোন বল্লো, এটাই আজমলের ঘর। আর আমরা তার বোন। এ আমাদের মা। এদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার পর আমিও বললাম, "আমি আফগানিস্তানের মুজাহিদ। পাকিস্তান থেকে এসেছি।" একথা শুনতেই তারা তিনজন কেঁদে ফেললো। আজমলের বৃদ্ধ মা বলতে লাগলো, "আপনি মা বাপ ভাই বোন ফেলে আমাদের সাহায্য করতে এতদুর এসেছেন। যতদিন আজমল না আসে ততদিন আপনি এখানে থাকবেন। আমরা যথা সাধ্য আপনার হেফাজতের ব্যবস্থা করবো।"

[চলবে]

সৌজন্যেঃ আল্-ইরশাদ

অনুবাদঃ মনজুর হাসান

একজন পর্যটকের দৃষ্টিতে

ইমাম শামিল (রাহঃ)

অধ্যাপক এস, আকবর আহমেদ

এ ছিল এক ক্লান্তিকর শান্তিমূলক কর্মসূচী। মধ্য এশিয়ায় পক্ষকালব্যাপী পরিশ্রমসাধ্য সফর এবং তথ্যচিত্রের জন্য দৃশ্যগ্রহণ আমাকে দৈহিক ক্লান্তির শেষ বিন্দুতে নিয়ে এসছিল বলা যেতে পারে।

কিন্তু এজন্য আমার বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই। কারণ এই সফর ছিল দাঘিস্তানের মর্দে মুজাহিদ ইমাম শামিলের স্মৃতিরোমন্থন ও তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এক বিরল সুযোগ। তাঁর পাহাড় প্রমাণ ব্যক্তিত্ব এবং দাঘিস্তানের জাতীয়তা ও নিজস্ব পরিচিতি রক্ষায় তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা পুনরাবিষ্কারের অপূর্ব মওকা আমাকে দারুণভাবে টানছিল। সেই সঙ্গে পূর্বের রুশযুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত উত্তর ককেশিয়ার স্বল্প পরিচিত অথচ ঐতিহ্যমণ্ডিত মুসলিম সমাজ সম্পর্কেও এই সফর জানার সুযোগ করে দিয়েছিল।

সুফী এবং মুজাহিদ—এই উভয় ভূমিকার সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় ইমাম শামিলের অসামান্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইমাম শামিল শুধু সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধেই তাঁর শক্তিশালী এবং সাহসিকতাপুর্ণ অভিযান চালান নি বরং সেই সঙ্গে তাঁর অদাঘিস্তানী স্বদেশবাসীদের উপর শরীয়তী শাসন ব্যবস্থা লাগু করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

ইমাম শামিল তামাম মুসলিম দুনিয়াতেই কম-বেশী পরিচিত। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর স্বদেশবাসীকে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার কবলে পড়ে সংখ্যা লঘু হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে। মহারানী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তাঁর পত্র বিনিময়, রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে তাঁর জিহাদ, ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর দৃঢ় সংকল্প প্রভৃতি তাঁকে জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তিতে পরিণত করেছিল।

খলিফা উমর (রাঃ) ছিলেন ইমামের আদর্শ। বলা হয়ে থাকে যে, বেআইনী কাজের অপরাধে নিজের মাকে তিনি চাবুক মারার আদেশ দিয়েছিলেন। উমর (রাঃ) তাঁর পুত্রকে যে শাস্তি দিয়েছিলেন, ইমাম শামিল ইনসাফের স্বার্থে তা অনুকরণের চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ অবধি ইমাম শামিলের পুত্রের ভূমিকাই মুখ্য হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে তিনি মায়ের পক্ষ থেকে নিজেই বেত্রাঘাত গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসেন।

ইমামের জীবন ছিল পাহাড়ী-শার্দুলের মতই রোমাঞ্চকর। কার্লমার্কস ও টলস্টয়ের মত ইউরোপের সুবিখ্যাত ব্যক্তিরা নিজেদের রচনায় ইমাম শামিল সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। 'স্বাধীনতা কি তা যদি উপলব্ধি করতে চান তাহলে ইমাম শামিলের দৃষ্টান্তের দিকে নজর দিন'-লিখেছেন কার্লমার্কস। কার্ল মার্কস-এর এই স্বীকৃতি বলশেভিক বিপ্লবের পর তাঁকে একই সঙ্গে শ্রদ্ধা ও বিরোধিতার এক অনন্য অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে; একজন মুসলিম ইমাম যিনি সারা জীবন ইসলামের জন্য সংগ্রাম করেছেন, স্বয়ং কার্লমার্কসও তাঁকে সপ্রশংস স্বীকৃতি দিয়েছেন।

বিগত শতাব্দীতে ইমাম শামিল দুটি বড় চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করেন। একটি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রসার রোধ, অপরটি শরীয়তী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন। ইমাম শামিল অসংখ্যবার রশিয়ানদের পরাস্ত করেছিলেন, কিন্তু দাঘিস্তান ছিল আবেষ্টনী পরিবৃত। জর্জিয়া, আজারবাইজান এবং সারকাশিয়া—যে রাজ্যগুলো দাঘিস্তানের ভৌগোলিক সীমাকে পরিবেষ্টন করেছিল—চারপাশের সে দেশগুলিকে রুশরা দখল করে নিয়েছিল। এক সময় দাঘিস্তানের দশ লক্ষ অধিবাসীর জন্য রুশরা দু' লক্ষ সৈন্য পাঠিয়েছিল, অর্থাৎ প্রতি ৫ জন মানুষ পিছু ১ জন করে রুশ সেনা। শেষ পর্যন্ত ইমামের পরাজয়ের সাথে সাথে দাঘিস্তানেরও পতন ঘটে।

ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল ইউরোপীয় উপনিবেশিকতাবাদের যুগ। আর শেষ পর্যন্ত তাদের হাতে ইমাম পর্যন্ত পরাস্ত হন। হজ্ব পালনের জন্য তিনি আরবে যান এবং সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। মদিনা আল মুনাওওয়ারায় তাঁকে দাফন করা হয়। দাঘিস্তানের রাজধানী মাখারকালার মিউজিয়ামে ইমাম শামিলের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র এখন গর্বের সঙ্গে দেখানো হয়। তাঁর সেই সবুজ ঝাণ্ডা এখন বিবর্ণ শ্বেত বর্ণের। তাঁর তলোয়ার, খঞ্জর এবং বিজয়ী রুশ সেনাপতির সামনে তাঁর আত্মসমর্পণের মুহূর্তটিকে ধরে রাখা হয়েছে এক বিরাট তৈলচিত্র করে। কিন্তু এই মুহূর্তেও রাশিয়ানরা তাঁকে রাজকীয় শালীনতা প্রদর্শন করে সম্মান জানায় তাঁকে। শামিলের দৈহিক সাহস ছিল কিংবদন্তির ন্যায় এবং তাঁর সারা গায়ে বহু ক্ষতচিহ্নের দাগ।

তিনি ছিলেন নক্শবন্দী ধারার অনুসারী। তাঁর নক্শবন্দী শেখ (আধ্যাত্মিক গুরু)-এর কন্যাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। তুরস্কে এখনও তাঁর বংশধররা রয়েছেন।

ইমাম শামিল ১৮৩৪ থেকে ১৮৫৯ অবদি শাসন করেছিলেন। অবশ্য তাঁর আগেও দু'জন ইমাম স্বাধীন ইমামত

প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়াস চালিয়েছিলেন। এতে সামন্ত প্রভু খানেরা মোটেই খুশী ছিল না। তারা শরীয়তী ব্যবস্তা প্রবর্তনের বিরোধী ছিল। কারণ শরীয়া আইন তাদের প্রভুত্বকে ব্যাপকভাবে খর্ব করেছিল এবং কর্তৃত্ব চলে যাচ্ছিল খোদায়ী আইন বলবৎ কারীদের হাতে। খানেদের কিছু ব্যক্তিকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। কেউ পালিয়ে গিয়েছিল আবার কেউ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার-এর আশায় রাশিয়ানদের সাথে গোপনে যোগাযোগ গড়ে তুলছিল। ইমাম শামিল তাঁর সরকার চালানোর জন্য একটি ইসলামী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, সেই সঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন দক্ষ প্রশাসককুল। তাঁর ছিল এক 'মজলিশে শুরা' (পরামর্শ পরিষদ) এবং ছিল নায়েববৃন্দ—যাঁরা কর্মক্ষেত্রে প্রতিটি জেলা প্রশাসনের প্রধানও ছিলেন। ইরোপীয় শক্তিগুলি মুসলিম এলাকা সমূহ যখন দখল করতে আরম্ভ করলো মুসলিম প্রতিরোধ বাহিনী তখন গ্রামীন ও পাহাড়ী উপজাতি এলাকাগুলিতে আশ্রয় নেয়।

এই প্রতিরোধ আন্দোলন পরিচালনা করার জন সুফী ভাবধারার বহু জনপ্রিয় নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল। সমগ্র মুসলিম জগতে এর প্রতিফলন দেখা যায়। সাইরিনা-ইকাতে সানুসি, সুদানে মাহাদি, সোয়াতে আখুন্দ, পেশোয়ারে সৈয়দ আহমাদ বেরলভি এবং দাঘিসতানে ইমাম শামিল মুসলিম জাগরণে নেতৃত্ব দেন। ইমাম শামিল এবং সোয়াতের আখুন্দের মধ্যে একটি লক্ষণীয় মিল দেখা যায়। দুজনেই ছিলেন সমসাময়িক এবং নকশ্‌বন্দী। দুজনেই তাঁদের অনুসারীদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে জেহাদে স্বয়ং নেতৃত্ব দেন। দুজনেই ইসলামী সমাজ ব্যাবস্থা গঠনের আশা পোষন করতেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যে শক্তিগুলোর সঙ্গে তাঁদের মোকাবিলা করতে হচ্ছিল তাঁদের প্রকৃতির উপরও অনেক কিছু নির্ভরশীল ছিল। ইমাম শামিল রুশদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। আর আখুন্দ দাঁড়িয়েছিলেন বৃটিশদের বিরুদ্ধে। বৃটিশরা ছিলো রুশদের অপেক্ষা অধিকতর উদার। এবং পরিশেষে তাঁরা আকুন্দের একজন বংশধরকে সোয়াতের শাসনকর্তা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। বৃটিশরা তাকে 'সোয়াতের ওয়ালী' এই সরকারী খেতাবেও অভিষিক্ত করে।

ইমাম শামিলের একটি কাহিনী রয়েছে। তাঁর পরাজয়ের পর তিনি হজব্রত পালনের জন্য আরবের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ওসমানীয় খলিফার সাথে এক পর্যায়ে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইমাম শামিলের দিকে খলিফা ও ওসমানীয় সুলতান মোসাফা করার জন্য তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। প্রত্যুত্তরে ইমাম শামিল তাঁর বাম হাত বাড়িয়ে দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'যখন রুশদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য আপনাকে আমার প্রয়োজন ছিল এবং আমি আমার ডান হাত প্রসারিত করেছিলাম সেই সময় আপনি আমায় কোন কিছুই দেন নি।' আজও মুসলিম দেশগুলোর শাসকদের সম্পর্কে একই ধরণের অভিযোগ শোনা যায়। ইমাম শামিলের স্মৃতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় নিজস্ব ও স্বকীয় পরিচিতি, গর্ব, সম্মান এবং প্রতিরোধের কথা। তিনি ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। রুশরা তাঁর গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁর স্পর্কিত সমস্ত উল্লেখ ও ইতিহাস-ঐতিহ্যকে যথাসম্ভব মুছে দেয়ার চেষ্টা করে। সরকারী ভাবে তাঁকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এখন তাঁর উপর অনেক তথ্য-চিত্র তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, নাটক ও পালা লেখা হচ্ছে। গত এক-দেড় বছরের মধ্যে ইমাম শামিলের নামে ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাট ও বিভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠেছে। দাঘিসতানে তাঁকে যে কত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়—এ হচ্ছে তারই প্রমাণ। শামীল সব সময় ছিল এক পরিচিত নাম-নীরব প্রতিবাদের প্রতীক। ইমামই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যাঁকে দাঘিসতানবাসীরা সব থেকে বেশী শ্রদ্ধা করে। এর মূলে রয়েছে তাঁর অবিরাম সংগ্রাম, সব রকম বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস এবং দৈহিক শক্তি মত্তা।

দাঘিসতান কৃষ্ণসাগর এবং কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যস্থিত একটি দেশ। এটি এমনই এক কেন্দ্রবিন্দু যেখানে তিনটি সংস্কৃতি, তিনটি সাম্রাজ্য এবং তিন জাতির লোক এসে মিলিত হয়েছে। এর উত্তরে রয়েছে রুশরা, পশ্চিমে তুর্কীরা এবং দক্ষিণে ইরানী বা পারসিকরা। পামির উপত্যকায় যেমন রুশ, চীনা এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য এসে মিশেছে-এটাও তেমনি আর এক সম্মিলন-বিন্দু। রাজধানী শহর মাথাচকালা হচ্ছে সোভিয়েত। আদলে তৈরি এক বিরাট, বৈচিত্রহীন, নিরানন্দ ও জীর্ণ শহর। আমরা প্রদেশের উপরাষ্ট্র প্রধানের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি সোভিয়েত আচার ও ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত এক দাঘিসতানী। তার ঘরে বসে বোঝার উপায় নেই যে, আমরা দাঘিসতানে রয়েছি। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের চাঁদ-তারা সমন্বিত নয়া ঝাণ্ডায় ইসলামের প্রতিফলন দেখা যায়। উপরাষ্ট্রপ্রধান জানালেন, এ সম্পর্কে বিবেচনা করা হচ্ছে জারের সময় থেকে এ অঞ্চলগুলিতে রুশদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব পড়েছে, তবে উল্লেখযোগ্য কোন কিছুই তারা সৃষ্টি করতে পারে নি। বিরাট কোন প্রাসাদমালা, উঁচুমানের কোন শৈল্পিক নিদর্শন-এসবের কোন কিছুই নয়। যা আছে তা খুবই নিকৃষ্ট, শ্রীহীন, এলোমেলো। দাঘিস্তান মধ্য-এশিয়া থেকে খানিকটা আলাদা প্রকৃতির। এই দুর্গম এলকার সীমারেখার মধ্যে প্রায় ২০ লাখ সুন্নী মুসলমানের বসবাস, এরা আবার ত্রিশটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত। তাদের রয়েছে নিজস্ব পুর্বপুরুষের বংশ তালিকা, নিজ নিজ প্রথা ও রীতি-নীতি এবং আঞ্চলিক ভাষা।

এদের জীবন ব্যবস্থায় গোষ্ঠীগত নিয়ম নীতি সমূহ (আদত) একই সঙ্গে এদের শক্তি ও দুর্বলতার পরিচায়ক। এই নিয়মনীতিসমূহ

প্রত্যেক গোষ্ঠীকে যেমন আত্মচেতনা বজায় রাখতে সহায়তা করে, অপরদিকে তাদেরকে জটিল নিয়ম-নীতির বেড়াজালে বন্দী করেও রাখে। উপজাতি গোষ্ঠীগুলো সংখ্যায় খুবই কম এবং অনেক সময়ই তারা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে। তারা নিজেরাও তাদের হতাশাজনক পরিস্থিতির ব্যাপারে সচেতন। রুশ সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের ঘেরাটোপে তারা ক্রমেই আবদ্ধ হয়ে পড়ছিল।

অথচ তারা হচ্ছেন ঘোরতর রূপে ইসলামী, ঘোরতর রূপে দেশজ এবং ঘোরতর গোষ্ঠীগত উপজাতি-সংস্কৃতির মানুষ। নবীর সম্মানে নামের সঙ্গে মুহাম্মদ যোগ করা তাদের সমাজে আবশ্যকীয়। তৃতীয় প্রজন্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার এখানে পূর্বপুরুষের একই নাম পুনরায় রাখা হয়। ফলে আমাদের এখানকার পরামর্শদাতা ডঃ মুহাম্মাদ খানের দাদুও ছিলেন মুহাম্মদ খান এবং এইভাবেই ট্রাডিসন বহমান রয়েছে।

দাঘিসতানীদের নিয়মনীতিসমূহের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাহসিকতার অনুভূতি, জাতি-ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামের সঙ্গে একাত্মতা। ওয়াদা পালনকে উচ্চ সম্মান দেওয়া হয়। নিজেদের মর্যাদা ও সাহসিকতাকে অতি মূল্যবান মনে করা হয়। দাঘিসতানের নিয়ম-নৈতিকতা অনুযায়ী বিদেশী উপনিবেশিকতাবাদীদের অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়ে থাকে। তারা বিশ্বাস করে, উপনিবেশনবাদীরা সম্মান বোধ বিহীন মানুষ। কেননা তারা সাহসিকতা, মেহমানদারী এবং ধর্মবিশ্বাসে আস্থাশীল নয়। দাঘিসতানীরা যে নীতি পদ্ধতি মেনে চলে তাতে রয়েছে 'নাসম'— সম্মান ও মর্যাদাবোধ এবং অন্যায়ের প্রতিকার। তাদের সাহিত্যে 'আদমকি' কথাটি এসেছে আদম থেকে অর্থাৎ এমন মানুষ হওয়া যে মানুষের সম্মান করবে, ভদ্র, দয়ালু ও মেহমান নওয়াজ হবে। তারপর হচ্ছে 'ঈমানকি' অর্থাৎ মুসলমান হওয়া, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে শ্রদ্ধা করা। এছাড়া রয়েছে সুফীইজম, আল্লাহ্'তে বিশ্বাস, নবীতে বিশ্বাস, কুরআনে বিশ্বাস, হাদীস ও জ্ঞানচর্চা। সেই সঙ্গে রয়েছে 'যিকির', যখন মানুষ নির্জনে আল্লাহ্'র নাম অবিরত উচ্চারণ করে হৃদয়ে ঈমানের শিখাকে প্রজ্জ্বলিত রাখে।

দাঘিসতানে অনেক ইসলামী প্রথাও রয়েছে। শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শয়তানকে তাড়ানোর জন্য তার চারপাশে কালো চক দিয়ে একটি বৃত্তরেখা এঁকে দেওয়া হয়। আমাকে বলা হল, এ হচ্ছে আদতের (দেশজ নিয়মপদ্ধতি) অন্তর্ভুক্ত। দাঘিসতানের সাধারণ মানুষ মনে করে, শরীয়ত বা ইসলামের সঙ্গে আদতের কোন সংঘর্ষ নেই, এটা শরীয়ত না হলেও অনৈসলামিক কিছু নয়। তারা যেমন শিশুর চারিদিকে চকের দাগ দেয় আবার তাকে কলেমাও শোনায়।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর ও উপজাতির অনন্য এ সমাজব্যবস্থাকে স্ট্যালিন ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করেছিলো। উপজাতি এবং অনেক গোত্রকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। কিন্তু দাঘিসতানের পাহাড় পর্বতের বাধা, দৃঢ়তর ঐক্যবদ্ধ সমাজ এবং উপজাতিদের শক্তিশালী নিয়মনীতির ফলে স্ট্যালিন পুরোপুরি সাফল্য লাভ করতে ব্যার্থ হয়। আরেকটি অলৌকিক ব্যাপার আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা দারবন্দের ঐতিহাসিক কেল্লাটির ছবি তোলা সবে শেষ করলাম। এই কেল্লাটি এখানে ইসলাম আগমনের পূর্বে তৈরী করা হয়েছিল। ককেশাস পর্বত এবং কাস্পিয়ান সাগরের মাঝে অবস্থিত এই দুর্গটি সক্রিয়ভাবে দক্ষিণ পারস্য সাম্রাজ্যের দিক থেকে যাযাবর জাতিদের আগ্রাসী অভিযানকে রুখে দেয়। এই দুর্গকে আরো মজবুত করা হয়েছে লোহার বিশাল শেকল দ্বারা। এগুলি কেল্লা থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। পারস্য ভাষায় এই দুর্গকে তাই দ্বারবন্দ বলা হয় অর্থাৎ ব'ন্ধ দ্বার'। দুর্গের বাইরে একটা গাছের নীচে বসে বহুদূর বিস্তৃত পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত দ্রাব সোবিয়েত শহরের দিকে কোনরূপ দৃষ্টিপাত না করে দৃষ্টিকে ইচ্ছামত মেলে দিলাম কস্পিয়ানের দিকে। আমাকে বলা হল যে, আরবরা যখন প্রথম এই এলাকায় আসে তখন তারা ইসলামের অন্যতম একটি প্রাচীন মসজিদ এই দ্বারবন্দ নির্মান করেছিল। এধরণের আর একটি অভিযানে আরবরা স্পেনে উপনীত হয়েছিল এবং অন্য আর একটি অভিযান তাদেরকে ভারতীয় উপমহাদেশের দ্বারপ্রান্ত সিন্ধু-এ নিয়ে আসে।

সোভিয়েত শাসনকালে দ্বারবন্দের মসজিদটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তাকে তারা একটি বড় হাজতে পরিণত করে। এখানে লোকদের ধরে এনে নৃশংস জুলুম চালানো হত। নামাযের মূল স্থানে রান্নাঘর স্থাপন করা হয়েছিল। দেড়-দু'বছর আগে মসজিদটি পুনরায় মুসলমানদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন নামাজের প্রায় ওয়াক্তে মসজিদটি মুসল্লী দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। নারী-পুরুষ সকলেই এখানে নামায পড়তে আসে। আমি বসে এই সমস্ত আলোড়নকারী ঘটনাবলী সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম। ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পারলাম আযানের বেহেশতি সুমধুর ধ্বনি ধীরে ধীরে আমার কানে প্রবেশ করছে। এবং রমনীয় শান্ত বিকেলটিতে তা আকাশে বাতাসে ভেসে চলেছে। ঐ মসজিদ থেকে আযানের এক আওয়াজ আসছিল। ঈমানদারদের তা প্রার্থনার জন্য আহবান জানাচ্ছিল— কল্যাণময় জীবনের দিকে। স্বচকিত বিস্ময়ের মধ্যে আমি হারিয়ে যাচ্ছিলাম।

রুশ বিপ্লবের পূর্বে দাঘিসতানে দু'হাজার পাঁচশ মসজিদ ছিল। মাত্র ডজন খানিক মসজিদ ছাড়া বাকি সবগুলিই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এখন এর মধ্যে দু'শ মসজিদ নব নির্মিত হয়েছে-নিয়মিত প্রার্থনা চলছে। স্ট্যালিনের আমলে এখানকার প্রায় তিন হাজার আলিমকে খুন করা হয়। এর ফলস্বরূপ জনগণের কাছে কেবল ইসলাম সম্বন্ধে মৌলিক কিছু জ্ঞানই অবিশিষ্ট ছিল। শুধু কুরআন এবং কিছু হাদীস তারা পড়তে পারত।

আমাদেরকে খাজবুলাত খাজবুলাতব (হিজবুল্লাহ'র রুশীয়করণ) তার গ্রামের প্রধান হলটি দেখালেন। খাজাবুলাতব দাঘিসতানের অন্যতম ইসলামী নেতা। এই হলে এসে রুশী সৈনিককেরা মদ খেত ও মাতলামী করতো। এখানে অশ্লিল ছবি ও

অশালীন অসামাজিক কাজকর্ম অবাধে চলতো। আমি নিজেই দেখলাম, বর্তমানে এটিকে এক মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। ছাত্ররা এখানে ইসলাম শিক্ষা করছে। এই গ্রামে ইতিমধ্যেই ত্রিশটি মসজিদ গড়ে উঠেছে। আমাদের দেখানো হ'ল কিভাবে রাশিয়ানরা করবস্থানের খোদাই করা পাথর এবং মসজিদ থেকে আরবী ক্যালিওগ্রাফি (কুরআনের আয়াত) খুলে নিয়ে গেছে। এগুলো তারা তাদের বিল্ডিং তৈরীতে ব্যবহার করেছে এবং সেগুলোর ঘোরতর অমর্যাদা করা হয়েছে। খাজবুলাতব দাঘিসতানেই ইসলামী উষার প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি আমাকে ঘনিষ্ঠভাবে বেশ কিছু প্রশ্ন করেনঃ "উজবেকিস্তানের কাফির প্রেসিডেন্ট করিমভকে বাদশা ফাহাদ কি করে কাবা শরীফে উমরাহ করতে যাবার অনুমতি দিলেন? তিনি কি জানেন না করিমভ একজন সাচ্চা নাস্তিক?"

এতদিনকার বে-ইনসাফির বিরুদ্ধে দাঘিসতানবাসীদের ক্রোধ যে ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে তার আলামতগুলি খুবই স্পষ্ট। আমাদের পরামর্শদাতা ডাঃ খানের চাচা আলী মুহাম্মদ নিউফিকে বাস করেন। এর অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় চার হাজার। প্রধান সড়ক থেকে দূরে হলেও দ্বারবন্দ থেকে আধঘন্টায় এখানে পৌছানো যায়। আলী মুহাম্মাদের বয়স প্রায় ষাট, ইউরোপীয়দের মতোই দেখতে, মুখে ক্লান্তির ছাপ। শরীর কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ। স্বল্পভাষী এই বৃদ্ধ আমাদেরকে উদার আতিথেয়তায় গ্রহণ করলেন। বললেন, তাদের এই গ্রামে কেউ কখনও অভুক্ত থাকে না। গ্রামের প্রত্যেকেরই ঘরের পেছনে ছোটছোট ব্যক্তিগত জমি আছে। লোকেরা সেগুলিতে নিজেদের জন্য শস্যাদি ও তরিতরকারি উৎপন্ন করে। কিন্তু গ্রামের গলিগুলো কর্দমাক্ত, নোংরা এবং বদ্ধজলায় পরিপূর্ণ। টিনের ছাদ এবং কাঠ দিয়ে স্বল্প খরচে তৈরি করা হয়েছে বাড়িগুলো। সেখানে টেলিফোন বা টেলিভিসনের বালাই নেই। পর্যটকেরও প্রশ্ন ওঠে না। দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্নই বলা যেতে পারে। মাখাচকালা থেকে নিউফিক রাস্তা বরাবর পথের দুধারে আমরা বহু আঙ্গুরের ক্ষেত, চেরী ফলের বাগান এবং সবুজ শস্যক্ষেত্র দেখেছি। দেশটি ফলেমূলে সমৃদ্ধ—আর সমুদ্র যোগান দেয় অফুরন্ত মাছ। কেবলমাত্র রুশীয় শাসন ব্যবস্থাই এমন এক সমৃদ্ধশালী দেশকে দারিদ্রের অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছে।

আলী মুহাম্মাদ আমাকে একটি কাহিনী শুনিয়েছিলেন, যা আমাকে শুধু অভিভূতই করেনি বরং সোভিয়েত শাসনের স্বরূপটিও আমার সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিল। সেই সঙ্গে ইসলামের তাকত ও অজেয় প্রাণশক্তিকেও নতুন করে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। আমার কৌতুহলী জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি তাঁর সাতবছর বয়সের এক ঘটনার কথা শোনান। মনে হল তাঁর জরা দূর হয়ে গেছে এবং অগ্নুৎপাতের মত তাঁর ক্রোধ ফেটে পড়ছিল। তিনি বর্ণনা করেনঃ বালক অবস্থায় যখন তিনি রাতে বিছানায় ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন, অপরিচিত ব্যক্তিরা কিভাবে জোর করে তাদের ঘরে ঢুকে পড়ে। তার মা-বাপকে বেইজ্জত করে এবং তাঁকে বিছানা থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়। সমগ্র পরিবারকে রাস্তায় নামতে হয়। তার বাবা-মা ছোট ভাই এবং তাঁকে এই বলে হুঁশিয়ারী দেওয়া হয় যে, যদি তাদেরকে গ্রামের পঞ্চাশ থেকে সত্তর মাইল পরিধির ত্রিসীমানায় দেখা যায় তা হলে গুলি করে মারা হবে। রুশদের কাছে তাদের অপরাধ ছিল তারা মুসলমান ও মধ্যবিত্ত চাষী। দিনের পর দিন ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করে তাঁরা তাদের পরিচিত জনৈক ব্যক্তির গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা বর্তমানের এ গ্রামটিতে বসতি করে। তাদের বংশের অন্য কেউ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সাহস করতে পারেনি—পাছে কর্তৃপক্ষের রোষ তাদের উপর আপতিত হয় এই ভয়ে।

ডঃ খানের চাচা নিজেকে আর ধরে রাখতে পরলেন না। দাঘিসতানের এই শক্ত মানুষটি আমাদের ভিডিও ক্যামেরার সামনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বললেন, কেন আমি এই রুশ শাসনকে ঘৃণা করবো না? তারা আমার চারজন আত্মীয়কে হত্যা করেছে, আমার জীবন বরবাদ করে দিয়েছে। ব্যথায় তাঁর মুখ কুচকে যাচ্ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কিভাবে এত দিন বুক বেঁধে রয়েছেন? আসমানের দিকে মুখ তুলে অশ্রুসিক্ত চোঁখে আলী খান বলেন, শুধু আল্লাহ্'র উপর ভরসা করেই আমি সবর করতে পেরেছি।

ফেরার পথে মাথাচালকা বিমানবন্দরে সোভিয়েত শাসন ও এলাকার লোকজনের প্রকৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ ঘটল। বিমান বন্দরে তুমুল বিশৃঙ্খলা। সমমেত জনমণ্ডলীর মধ্যে একরকম লড়াই করে রিসেপসনে পৌছালাম। কেউ ইংরেজি জানে না। এও জানে না, কি হচ্ছে বা কখন বিমান ছাড়বে। শেষ অবধি শোনা গেল, বিমানে তেল নেই, তাই যাত্রা অনিশ্চিত। পরে শুনলাম কেবল মস্কোর বিমানটি এখনই ছাড়বে। জনতা পাগলের মত ছুটতে লাগালো। তাদের ধাক্কায় ধাক্কায় আমিও এগিয়ে গেলাম। মনে ভয়, কে জানে কোন বিমানে চড়ে বসি। ফলে চিৎকার করতে লাগলাম মস্কো মস্কো বলে। নইলে কে জানে শেষ অবধি হয়তো অন্যকোন দুর্গম প্রজাতন্ত্রের আরও দুর্গম বিমান ঘাঁটিতে নামিয়ে দেবে। শেষ পর্যন্ত উড়ো জাহাজে উঠে এলাম। প্রত্যেক এ্যারোফ্লাট প্লেনের যা বৈশিষ্ট্য, খোলা টয়লেট, গা গোলানো দুর্গন্ধ মুহূর্তের মধ্যে আমার নাকে এসে লাগলো। উড়ো জাহাজের ভেতরটা ছিল হট্টগোলে পরিপূর্ণ। অশান্ত দাঘিসতানীরা জোর গলায় কথাবার্তা বলছিলেন। এই পরিস্থিতিতে ব্রিফকেস খুলে কুরআন বের করে পড়া ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর ছিল না। আমার পাশের যাত্রী আমাকে কুরআন পড়তে দেখে যেই আবিষ্কার করলেন যে, আমি মুসলমান, তিনি উত্তেজিতভাবে নিজেদের ভাষায় সহযাত্রীদের কাছে তা ঘোষণা করলেন। সংগে সংগে আমাকে বহু যাত্রী চেরীফল ও রুটি বাড়িয়ে দিলেন, ভালবাসার প্রতীক হিসেবে আমি তা গ্রহণ করলাম। আমার পাশের যাত্রী আমার কুরআনটি হাতে নিলেন, যদিও আমরা একে

অপরের ভাষা কিছুই জানি না—তিনি আরবিতে কয়েকটি বাক্য লিখে গর্বের সঙ্গে আমাকে দেখালেন।

আমি তাকে কুরআনটি উপহার দিলাম। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, অলৌকিকভাবে দাঘিসতানে ইসলামী চরিত্র ধীরে ধীরে আবার ফিরে আসছে। নইলে কোথায় তিনি কুরআন পড়া শিখবেন? দাঘিসতান থেকে নাম করা আধুনিক সোভিয়েত শিল্পী ও বহু মহাকাশচারীরা প্রখ্যাত হয়েছেন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, তারা যেন সোভিয়েত ব্যবস্থায় মিশে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রুশদের সঙ্গে দাঘিসতানী জনগণের বিন্দুমাত্র ভালবাসাও অবশিষ্ট নেই। দঘিসতানীরা মনে করে, রুশরা নীচুমানের সংস্কৃতির মানুষ। তারা লোভী, তাহজীবহীন। মেহেমানদারী কি বস্তু তা রুশীরা জানে না। সর্বোপরি তারা ভয়ানক ভীতু। তাদের বিধি বিধান বলে কিছু নেই। ফলে তারা অবজ্ঞার পাত্র।

দাঘিসতানের লোকেরা এখনও আত্মপ্রত্যয়ের সাথে মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে হাঁটে। তাদের দেশজ আচার-ঐতিহ্য নিয়ে তারা গর্বিত যা গড়ে উঠেছে শরীয়া ও আদতের এক অপূর্ব সমন্বয়ে। তারা বয়স্কদের সম্মান করে এবং নারীদের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যাবহার করে। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত সেখানে শরীয়তী আদলত চালু ছিল। তারা এই বলে গর্ব করে যে, দাঘিসতান ছিল ইসলামী ইলম্ ও শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র। সারা দুনিয়া থেকে মুসলমানরা এখানে জ্ঞান হাসিল করতে আসত।

বেশির ভাগ দাঘিসতানীই বর্তমান রুশশাসন থেকে মুক্তি পেয়ে সম্পূর্ণ আজাদী অর্জন করার পক্ষপাতী। তারা মনে করে দাঘিসতানের যে সম্পদ-উপকরণ রয়েছে তা তাদের ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট। তাদের রয়েছে পেট্রল, গ্যাস, শুকনো ফলমূল, সমুদ্র, পাহাড়, উর্বর উপত্যকা। কিন্তু তারা এও জানে যে, কূটনৈতিক দিক থেকে তারা এক জটিল ভৌগোলিক-রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এছাড়া, দাঘিস্তানে এখন দু'লাখ রুশ আস্তানা গেড়ে নিয়েছে। কাজেই দাঘিস্তানীরা যদি পূর্ণ আজাদীর সংগ্রাম শুরু করে তাহলে ভবিষ্যৎ খুব একটা মসৃণ হবে না। তাই বলে কি তারা বসে থাকবে? না তারা পরাধীনতার শেকল জড়িয়ে নিরব থাকার জাতি নয়। ইমাম শামিলের স্বপ্ন তারা বাস্তবায়িত করবেই—ইনশাআল্লাহ্। ❐

সুসংবাদ! সুসংবাদ!! সুসংবাদ!!!

রেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বাংলাদেশ কওমী মাদ্রসা শিক্ষা বোর্ড) এর পক্ষ হতে ইসলামী আদর্শ মূল্যবোধের ভিত্তিতে বেফাকের প্রাইমারীর সকল বিষয়ের বই পুস্তক প্রনয়ন ও প্রকাশ করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং শীঘ্রই কওমী পাবলিকেশন্স এর মাধ্যমে উহা প্রকাশ ও বাজারজাত করা হচ্ছে-ইন্শাল্লাহ্।

অতএব সকল কওমী মাদ্রাসায় অত্র বই পুস্তক সমূহ পাঠ্য করার জন্য এবং অন্যান্য বই পাঠ্য না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(মাওলানা) আবদুল জব্বার
সাধারণ সম্পাদক

বেফাকুল মাদারিসিল আরবিয়া

বাংলাদেশ।

বিঃ দ্রঃ সার্বিক যোগাযোগঃ কওমী পাবলিকেশন্স
১৫৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক, এলাকা, ঢাকা-১০০০

মরণজয়ী মুজাহিদ

মল্লিক আহমাদ সরওয়ার

সায়েমা এবং খলীল বকরীর বাচ্চাটি মরে যাওয়ায় ভীষণ কষ্ট পায়। যার কারণে ওরা রাতের খানাও খেল না। অনেক রাত পর্যন্ত বিছনায় শুয়ে শুয়ে মায়ের নিকট বকরীর বাচ্চাটির কথা আলোচনা করতে করতে এক সময় ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে সায়েমার আম্মা দেখলেন, বকরীটিও রাতে কিছু খায়নি। খাওয়ার জন্য ঘাস পানি যা দেয়া হয়েছিলো পুরোটাই রয়ে গেছে। পরের দিন আলী তাদের জমীন পার হয়ে পাহাড়ের ওপর উঠলে আচানক দেখতে পায়, অদূরেই একটি মানুষ উপুর হয়ে পড়ে আছে। নিকটে যেয়ে দেখে, এযে তার দোস্ত আহমাদ গুল! বেহুশ অবস্থায় পড়ে আছে আহমাদ গুল। তার আহত বাযু বেয়ে দর দর করে রক্ত ঝরছে। মূলত তার সম্পূর্ণ হাতটাই বাযু থেকে আলাদা হয়ে গেছে। আলী তাকে তুলে তাদের বাগানের মধ্যে নিয়ে আসলো। ইতিমধ্যে আলীর পিতাও সেখানে এসে উপস্থিত হয়। আলী পিতাকে সব ঘটনা খুলে বলে। বাপ-বেটা সেবা শুশ্রুসা ও চেষ্টা তদবীরে এক সময় হুশ ফিরে আসে আহমাদ গুলের। সে তাদেরকে বলে, 'পাহাড়ের ওপর বেড়াতে আসলে এক জায়গায় সে একটি সুন্দর কলম দেখতে পায়। চমৎকার দর্শনীয় কলমটি সে হাতে তুলে নেয়। এর সাথে সাথে সেটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এতটুকু মনে আছে। এরপর কি হয়েছে তা' জানি না।

সেদিন দুপুর বেলা সায়েমা এবং খলীল ঘর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের ওপরে খেলা করার জন্য এসে দাড়ায়। যেখানে বকরীর বাচ্চাটির মৃত্যু ঘটেছিলো বেশ কিছুক্ষন সেখানে খেলার ছলে ছুটা ছুটি করছিলো। এসময় সায়েমা অদূরেই একটি সুন্দর বস্তু দেখতে পেয়ে দৌড়ে সেদিকে যায়। বস্তটি ছিলো সুন্দর একটি ঘড়ি। সায়েমা খলীলকে বলে দৌড়ে ঘড়িটির কাছে যেয়ে হাতে তুলতেই সেটি বিকট শব্দে বিস্ফিারিত হয়। সাথে সাথে সায়েমা হুশ হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অবস্থা দেখে খলীল ভীষণভাবে ঘাবড়ে যায় এবং চিৎকার করতে করতে দৌড়ে বাড়ী চলে আসে।

সায়েমার আব্বা পাহাড়ের ওপর উঠে যা' দেখলেন, তা' ছিলো খুবই মর্মান্তিক। সায়েমার একটি বাযু সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে টুকরো টুকরো অবস্থায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে। ঘাড় ও মুখায়বও তার জখম হয়েছে। যখম থেকে প্রবল বেগে রক্ত ঝরছে। সায়েমার আব্বা তাকে কোলপাজা করে বাড়ী নিয়ে আসলে এক হৃদয় বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাড়ী শুদ্ধ স্বশব্দ কান্নার রোল পড়ে যায়।

দু'দিন পরে আলী ও তার আব্বা আহত সায়েমাকে নিয়ে বরফ বেষ্টিত পাহাড় এবং ঘন বন-জঙ্গল অতিক্রম করে রুশী ফৌজদের থেকে গা বাঁচিয়ে মুজাহিদদের এক ঘাঁটিতে এসে পৌছে। মুজাহিদরা গাড়ীতে করে তৎক্ষণাৎ সায়েমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ডাক্তার সায়েমাকে পরীক্ষা করে হতাশা প্রকাশ করে বলেন, "বাচ্চাটিকে তা ৎক্ষণিকভাবে পৌছালে বাঁচানো সহজ হতো। কিন্তু তারপরও আমরা চেষ্টায় ত্রুটি করব না।"

তিন দিন পর হাসপাতালে সায়েমার হুশ ফিরে আসে। সায়েমাকে চোখ খুলতে দেখে আলী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বাজার থেকে তার জন্য বহু রকমের বিভিন্ন খেলনা এনে তার সামনে রেখে দেয়। যার মধ্যে প্লাস্টিকের একটি সুন্দর ঘড়িও ছিল। সায়েমা চোঁখ খুলে প্লাস্টিকের ঘড়িটার দিকে তাকিয়েই চিৎকার দিয়ে দ্বিতীয়বার বেহুশ হয়ে পড়ে।

ডাক্তার চিৎকার শুনে ছুটে আসেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন সায়েমার হুশ ফিরিয়ে আানার জন্যে। কিন্তু ডাক্তারের সকল চেষ্টা বিফল হলো। ক'মিনিট পর হাতাশার সাথে ডাক্তার বল্লেন, "মেয়েটি আর জীবিত নেই। তাররূহ এখন জান্নাতবাসীদের সাথে মিলিত হয়েছে।"

আলী ডাক্তারের কথা শুনে আদরের ছোট বোন সায়েমার লাশের উপর পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠে। নিশ্চল পাথরের ন্যায় মুক হয়ে চেয়ে থাকে আলীর আব্বা নিষ্পাপ মেয়ের চেহারার দিকে। তার চোখ দিয়েও ঝরছিলো অঝোরে অশ্রুর ধারা। দীর্ঘক্ষণ পর পিতা পুত্রের অবস্থায় কিছুটা স্বাভাবিকতা ফিরে আসলে ডাক্তার বললেন, "সায়েমা খেলনার সেকেলে তৈরী বারুদী বোমার আঘাতে আহত হয়েছিলো। এই বোমাগুলো খুবই খতরনাক। যা রুশী ফৌজরা আফগানিস্তানের আগামী প্রজন্মকে ধ্বংস বা পঙ্গু করে দেয়ার উদ্দেশ্যে এখানে সেখানে ফেলে রাখছে। এই কয়দিনে বারুদী খেলনা বোমায় আহত বহু শিশু কিশোর যুবককে আমরা চিকিৎসা করেছি। তাদের মধ্যে অনেকেই শাহাদত বরণ করেছে। তাদেরকে আমরা বহু চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারিনি। এ খেলনা বোমা রুশী ফৌজরা মানুষ চলাচল

পথে চারণভূমিতে এবং বসতিপূর্ণ পাহাড়ের ওপর ফেলে রাখে। যাতে স্পর্শকারীর শরীরের কোন একটি অংগ নষ্ট বা বিকল হয়ে যায়। কখনো কখনো ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারাবার কথাও শুনা যায়। দেখতে সুন্দর এই সব খেলনা বোমা শিশুরা হাতে নিতেই বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হয়। রুশী ফৌজদের এই হীন কাজ বড়ই অমানবিক ও হৃদয় বিদারক। তারা এই জঘন্য পথে আফগান জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেয়ার পায়তারা চালাচ্ছে। এর দ্বারা সকলকে ভীত সন্ত্রস্ত করার প্রয়াস চলছে। যেন বড় হয়ে এ প্রজন্ম রুশী ফৌজদের মুকাবিলায় হাতিয়ার উঠাতে হিম্মত না করে। সাথে সাথে তারা আফগান জাতিকে চিরদিনের জন্য গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখছে। এর পর তারা থাবা বিস্তার করবে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে।"

আলী খুব মনোযোগের সাথে ডাক্তারের কথা গুলো শুনলো। নিজের অজান্তেই মুষ্টিবদ্ধ হয় তার হাত। তার বুকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো প্রতিশোধের অনির্বাণ শিখা। মনে মনে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, এ যালিম রুশীদের থেকে তার প্রিয় বোন সায়েমার খুনের বদলা সে নি-বে-ই।

সায়েমার লাশ নিয়ে ফেরার পথে আলী তার আব্বাকে জিজ্ঞেস করে,

ঃ আব্বু, রুশীরা আফগানীদেরকে কেন হত্যা করছে?

জবাবে তার আব্বা বলেন, "আসলে আফগানীদেরকে নয় বরং ওরা মুসলা-মনদেরকে হত্যা করছে। কেননা আফগানের মুসলমানরা যে আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাস করে—এটাই তাদের অপরাধ।"

আলী পুনরায় জিজ্ঞেস করে,

"আব্বু, রুশীরা আল্লাহ্ ও রাসুলকে শত্রু মনে করে কেন? আল্লাহ্ তো আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের জন্য তৈরী করেছেন কত রকম ফল-ফুল, সবুজ পৃথিবী, নীল আকাশ। আল্লাহ্র রাসুল তিনিও তো কত ভাল মানুষ। তিনি কাফির মুশরিকদের ছেলেদেরকেও তো কত আদর করতেন। অসুস্থ দুশমনকেও তিনি সেবা শুশ্রুসা করতে যেতেন এবং তাদের রোগ মুক্তির জন্যে দুআ' করতেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ঐ সকল দুশমনদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন যারা তাঁর উপর সীমাহীন যুলুম নির্যাতন চালিয়ে স্বদেশ-মাতৃভূমি ত্যাগে তাকে বাধ্য করেছিলো"। আলীর কথা শুনে তার আব্বা বল্লেন,

"বেটা! রুশীরা শয়তানের অনুসরণ করে, আর শয়তান হলো আল্লাহ এবং রাসূলের কাট্টা দুশমন। রুশীরা মনে করে, আল্লাহ বা সৃষ্টি কর্তা বলতে কিছু নেই। মানুষ, জীব-জন্তু, গাছ-পালা সবকিছু এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে। পরকালেও তারা বিশ্বাস করে না। এজন্য যুলুম করতে ওরা মোটেও দ্বিধা করে না। কেননা যুলূমের জন্য পরকালে শাস্তি ভোগ করার ভয় তাদের নেই। মনে রেখো, যে সব লোক বা জাতি আল্লাহ্র ওপর ঈমান ও বিশ্বাস রাখে না তারা এই বর্বর রুশীদের ন্যায় সীমাহীন অত্যাচারী হয়ে থাকে। অত্যাচার করাকে তারা অন্যায় মনে করে না। শয়তান ও এদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।"

গ্রামে পৌঁছে তারা খবর পেল যে, আরো অনেক শিশু এ বারুদী খেলনায় শহীদ হয়েছে এবং যখমী হয়েছে অসংখ্য। সায়েমার লাশ নিয়ে আসলে দীর্ঘক্ষণ ধরে সায়েমার আম্মা ও ফুফু কান্না কাটি করে। কোন ভাবেই আলী তার মার কান্না থামাতে পারছিলো না। আলী তার আম্মুকে লক্ষ্য করে বললোঃ "আম্মু চোখের পানি মুছে ফেল!"

প্রতিশোধের অগ্নিতে প্রজ্জলিত আলী শপথ করে বল্লো, "আমি এক একটি রুশীকে কতল করে বোন সায়েমার এক এক ফোটা খুনের বদলা নিব। ওদের এদেশ থেকে তাড়াবই। খোদার দুশমনদের বুঝিয়ে দেব, যে কওম আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে মানে না তারা যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন ধ্বংস ও পরাজয় তাদের অনিবার্য।"

এমনিভাবে ছোট ছোট শিশু যখমী ও শহীদ হওয়ার ফলে গ্রামময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাপ মা ছোট বাচ্চাদেরকে ঘর থেকে বের হতে দেয় না। এমন কি বহু পরিবার এরই মধ্যে নিজের প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরত করে পাকিস্তানের পথে পাড়ি জমিয়েছে। নিরবতা ও উদাসিনতার মধ্য দিয়ে আলীর দিনগুলো কাটলেও হৃদয়ে তার প্রতিশোধের বহ্নিশিখা দিন দিন প্রজ্জলিত হচ্ছে। কোন কাজেই তার মন বসছে না।

ঘুমের ঘোরে প্রায়ই সায়েমাকে সে যখমী অবস্থায় খুনের মাঝে তড়পাতে দেখে। কয়েক বার সে তার আব্বুর নিকট মুজাহিদের সাথে যোগ দেয়ার জন্যে অনুমতি চেয়েছে। কিন্তু আব্বা তাকে প্রবোধ দিয়ে বলেছে, "বেটা তুমি এখনো ছোট। অস্ত্র তুলে যুদ্ধ করার মত বয়স, শক্তি ও বুদ্ধি তোমার এখনও হয়নি। কিছু দিন অপেক্ষা কর।"

খলীল এখন আর পাহাড়ে গিয়ে খেলা করে না। সারাটা দিন উদাসীন ভাবে তার আম্মার কাছে বসে থাকে। বকরীটিও বুঝি তার বাচ্চাও সায়েমার মৃত্যু যন্ত্রণা সয্য করতে পারল না। সকাল বেলা ওঠে দেখে, রাতের কোন এক সময় বকরীটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। [চলবে]

যে লোক মরে গেল, কিন্তু যুদ্ধ বা জিহাদ করল না—জিহাদ করার কোন ইচ্ছাও তার মনে জাগেনি, সে মুনাফিকীর একটা অংশ নিয়েই মরল।

—আল হাদীস

মরণ খেলা

মুঃ আঃ গনি খান

কুয়োর মাঝে কতক ব্যাঙ করছে কোলাহল,
তাই শুনে যে বালক দলের হলো কৌতুহল।
কুয়োর কাছে গেল তারা ঢেলা নিয়ে হাতে
মহানন্দে ছুড়ছিল তা ব্যাঙ গুলোরই গায়ে।
সেই আঘাতে পড়তেছিল ব্যাঙগুলো সব মারা
বালকেরা দেখে তাহা হেসেই আত্মহারা,
একটি ব্যাঙ জেগে বলে, শুনো বালক দল,
তোমাদের খেলায় মরে যাচ্ছি আমর যে সকল।
তোমাদের এই আনন্দ খেলা মোদের মৃত্যুবাণ,
দয়া করে এই খেলাটির কর অবসান।
একের খেলা অন্যের কাছে মৃত্যুর কারণ
আল্লাহ পাক কি খেলতে তাহা করেননি বারণ।
পরিহার করে যারা এমন নিষ্ঠুর খেলা,
আল্লাহ্‌র কাছে তাদের তবে ইনাম আছে মেলা।

ফিরে এসো ঘরে

এস, এম, আবদুছ ছালাম আজাদ

ভুলে যাব বেদনা
ফিরে এসো ঘরে
করে দেব ক্ষমা
নেব বুকে তুলে।
আদর্শের মনি মুক্তা জমা তবে 'ধর্মে'
আছে বল তব বাহু বর্মে,
আছে প্রেম, মৈত্রী, ঐক্য, শান্তি
নেই যাতে মিথ্যা কোন ভুল ভ্রান্তি।
শয়তানের ফাঁদে পড়ে
ফেলেছে ভুল করে
সে ভুলের জন্য কর অনুতাপ
ফিরে এসো ঘরে।

অভিযান

মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ (দুদু)

আবার মোরা নতুন করে
পুণ্য জ্ঞানে ধন্য হয়ে,
অতীত ব্যাথা ভুলে গিয়ে
গড়বো জীবন নতুন করে।
রইব না আর ঘরের কোনে
বাহির হব দূর ভুবনে,
থাকব না আর সবার পিছে
যাবো মোরা সবার আগে।
মনে জেগেছে নতুন সাধ
ভুভন করব আলোকপাত,
তরুণ রবির রক্ত রেখা
ঐ আকাশে যায়রে দেখা।
কে বলেছে দুর্বল মোরা
অভিযানে আয়রে তোরা।
বাঁধা বিঘ্ন আসুক যত
এগিয়ে যাবো রীতিমত।
পথেই যদি আসে মরণ
স্বেচ্ছায় তাহা করব বরণ,
নও জীবনের চাই সন্ধান
তাইতো মোদের এই অভিযান।

বিশ্বাস

মোঃ আজিজুর রহমান

মোরা মুসলিম মোরা যে বীর যোদ্ধা
দেখ চেয়ে ঐ আসিল জালীম খুনীরা।
ওরা চায় ধ্বংস
ওরা চায় খুন,
সকলেরে ওরা বানাবে বেদীন।
ওরে ভয় নাই, ওরে ভয় নাই
মৃত্যুকে মোরা করি নাকো ভয়।
নির্ভয়ে প্রাণ যে করিবে দান
নাহি কেহ আর তার চেয়ে মহান,
ধর সবে কষি
ইসলামের অসি,
বিশ্ব করিব জয়।
আসুক মৃত্যু আসুক ভয়
আসুক দুঃখ আসুক লয়।
সহায় মোদের এক যে আল্লাহ
মুহাম্মাদ মোদের রাসূলুল্লাহ।

✪ হাঃ মোঃ ফারুকুজ্জামান,
শামছুল উলুম মাদ্রাসা,
পঃ খাবাসপুর,
ফরিদপুর।

প্রশ্নঃ হযতর আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) বেহেশতের মধ্যে যে 'গন্দম' খেয়েছিলেন বস্তুত সেই 'গন্দম' কি?

উত্তরঃ গন্দম (আটা) বলতে যা বুঝায় বেহেশতের মধ্যে তাঁরা তা খেয়েছিলেন বলে কোন নির্ভাযোগ্য দলীল পাওয়া যায় না। নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে জানা যায় যে, তাঁরা উভয়ে শয়তানের প্ররোচনায় যে গাছের ফল খেয়েছিলেন সেই গাছটির নাম 'অমরবৃক্ষ'। এই গাছের ফল খাওয়া তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করায় বেহেশত থেকে তৎক্ষণাৎ তাদেরকে পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রেরণ করা হয়। এঁরাই পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রথম মানব মানবী। তাঁরাই আমাদের সকলের আদি পিতা-মাতা। তাই পৃথিবীর মানুষকে বলা হয় আদম সন্তান।

✪ মাহমুদুল হাসান রায়হান মজুমদার
সাংঃ হিলালনগর,
পোঃ কাশীনগর,
জিলাঃ কুমিল্লা।

প্রশ্নঃ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর জানাযা নামাজের ইমামতি কে করেছিলেন। তাঁর জানাযায় কত লোক শরীক হয়েছিল, কে কে তাঁর কবর খনন করেন এবং কে কে তাঁকে কবরে রাখেন?

উত্তরঃ রাসূল (সাঃ) ছিলেন কুল কায়েনাতের ইমাম, তাঁর জানাযায় ইমামতি করার মত কে থাকতে পারে? তাই উম্মতের সদস্য তাবৎ পুরুষ, নারী ও শিশুগণ দলে দলে এসে পৃথকভাবে জানাযা আদায় করতে থাকেন। দীর্ঘ দেড়দিন ব্যাপী এ অনুষ্ঠান চলতে থাকে।

তাঁর কবর খনন করেন হযরত আবূ তাল্‌হা (রাঃ) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দেহ মোবারক কবরে রাখার জন্য হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (রাঃ), উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ নিচে অবতরণ করেন।

✪ আতিকুল্লাহ জুলফিকার,
পাঁচলাইশ কলেজ,
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

প্রশ্নঃ বহু বিজ্ঞ আলিমের মুখে শুনেছি যে, 'ইসলামে বৈরাগ্যতার স্থান নেই।" ইদানিং জনৈক ব্যক্তি বল্লেন, ব্যক্তি বিশেষের জন্য বৈরাগ্যতা জায়িয। ইসলামের আলোকে এর সমাধান জানতে চাই।

উত্তরঃ সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্যতা বরণ করা ইসলামের দাবী ও আদর্শ বিরোধী একটি কাজ। কুরআন ও হাদীসে এর সমর্থনে একটি কথাতো নেই-ই বরং এর থেকে মুসলমানদেরকে নিরুৎসাহিত করা ও তাদের মনে এর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করণমূলক বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

একদিন কতিপয় সাহাবী শুধু এই উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিবিগণের খেদমতে হাজির হলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইবাদাতের হালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। তাঁরা মনে করতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দিন-রাত আল্লাহ্‌র ইবাদাত ব্যতীত আর কিছুই করেন না। মূল ঘটনা সম্পর্কে তাদের বলা হলে তারা অবাক হন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে আমাদের তুলনা হয়? আল্লাহ্ পাক তাঁর পূর্ব-পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

এরপর তাদের একজন বলতেছিলেন, আমি নিয়মিত রাতভর নামায আদায় করব। আর একজন বল্লেন, আমি সারা জীবন রোজা রাখব। তৃতীয় জন বল্লেন, আমি জীবনে বিবাহ করব না।

তাদের মনভাব জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, "আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্‌কে বেশী ভয় করি। তবু আমি রোজা রাখি, ইফতার করি, নামায পড়ি, নিদ্রা যাই, মহিলাদেরকে বিবাহ করি। তাই যে আমার তরীকার ওপর চলবে না, সে আমার দল থেকে খারিজ।"

জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাজীর হয়ে আরজ করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি এমন একটি কুয়ার সন্ধান পেয়েছি (যাতে রয়েছে প্রচুর পানি এবং যার পাশে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট পল্লী) সেখানে প্রয়োজনীয় সবকিছুই আছে। আমার মন চায়, সেখানে একাকী জীবন যাপন করে দুনিয়ার সম্পর্ক থেকে দূরে থাকি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বল্লেন, "আমি ইয়াহুদিয়াত ও নাসারানীয়াত নিয়ে আগমন করিনি বরং আমি নিয়ে এসেছি সরল ও আরামপ্রদ মাজহাবে ইব্রাহীম।"

এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে, ইসলামে বৈরাগ্যতা বরণের সামান্যও দখল নেই?

✪ মোঃ আবদুল হক আযাদী,
চাড়াখালী, বামনা,
বরগুনা

প্রশ্নঃ *হক্কানী পীর চিনবার উপায় কি? ইসলামের দৃষ্টিতে পীরের মুরিদ হওয়া বাধ্যতামূলক কিনা?*

উত্তরঃ যে পীর সাহেব কুরআন হাদীস সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান রাখেন, যিনি কোন মাধ্যম ও সহযোগী গ্রন্থ ব্যতীত মূল কুরআন ও হাদীস সরাসরি বুঝতে সক্ষম, ফরজ ওয়াজিব পালন সহ সুন্নাতের পাবন্দ এবং সীরাত ও সুরাতে যাকে দেখলে বা যার সংস্পর্শে আসলে আল্লাহ্ ও আখেরাতের কথা স্মরণ হয় এবং দ্বীনের পথে দৃঢ় হয়ে চলার আকাংখা ও আগ্রহ উদ্বেলিত হয়। এমন পীরকে হক্কানী পীর বলা যায়।

হক্কানী পীরের মুরীদ হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কোন বাধ্যতা-মূলক বিষয় না হলেও ইসলামী জ্ঞান যাদের কম, প্রয়োজনীয় বিষয়েও যারা ইসলামের দৃষ্টিতে ফয়সালা নির্দ্ধারণে অক্ষম। তাদের জন্য যে কোন একজন হক্কানী পীরের সাথে সম্পর্ক রেখে তার অনুসরণ ও পরামর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করা অপরিহায্য বলাই ঠিক। তাছাড়া সকল প্রকার লোকের বেলায় আত্মশুদ্ধির জন্য হক্কানী পীরের বায়আত গ্রহণ ও তাদের মজলিসে যোগদান ও তাদের বরকতময় সোহবাতে সময়দান খুবই জরুরী। তবে পীর হক্কানী হওয়া চাই এবং তাঁকে অবশ্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদায় বিশ্বাসী হতে হবে। তাঁর পক্ষে সমকালীন হক্কানী আলিমগণের সমর্থন থাকতে হবে।

✪ এম, এ, ওয়াহিদ নোমানী
ছাত্র জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া,
কাজির বাজার, সিলেট।

প্রশ্নঃ *আমার মূল নাম 'এম, এ, ওয়াহিদ'। দুটি কারণে আমি আমার নামের শেষে 'নোমানী' সংযুক্ত করেছি। এক, বিশেষ একটি ট্রেনিং কোর্সে যোগদান করলে সেই ট্রেনিং কোর্সের ওস্তাদ যিনি আমার নিকট অগাধ শ্রদ্ধার পাত্র তিনি আমাকে নোমান বলে ডাকতেন। দুই, আমাদের মাযহাবের ইমাম সাহেবের নাম ছিলো নোমান ইবনে-সাবেত। তাঁর রূহানী ফযেয ও বরকতলাভেরআশায় আমি আমার নামের শেষে 'নোমানী' লকব যুক্ত করেছি। শরীয়াতের দৃষ্টিতে এটা কোন্ পর্যায়ের, বিস্তাতির জানালে উপকৃত হব।*

উত্তরঃ আপনার উদ্দেশ্য ভালো হলেও এটা বাহুল্য। আমাদের অনুসরণীয় বুযুর্গগণ পিতৃদত্ত নামটি লিখেই ক্ষান্ত হন। এতে তাদের জীবন কম বরকতময় হয়নি। লোক এতেই তাদেরকে চিনে। এটাই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রশংশনীয়। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানদের যে সরলতা ও অকৃত্রিম জীবনাচরণ ছিল, আজও যদি আমরা সে আদর্শ অনুসরণ করতাম তাহলে কতই না ভালো হতো।

✪ খান মোঃ মুজিবুর রহমান,
আল জামেয়াতুল আরাবিয়া দারুল উলুম,
দেওভোগ,নারায়ণগঞ্জ।

প্রশ্নঃ *(ক) পবিত্র রযমান মাসে রোযাদারের সঙ্গে অমুসলিম হিন্দু ধর্মের লোকের ইফতার করা জায়িয কি?*

উত্তরঃ রোযা রেখে ইফতার করাও একটি ইবাদাত। ইবাদাতের মধ্যে অমুসলিমদের অংশগ্রহণ দোষনীয় এবং অপরাধ। তবে রোযার মত ইবাদাতের বেলায় ইফতারের সময় অমুসলিমদের অংশগ্রহণে রোযার ক্ষতি হবে না ঠিক। তবুও এ থেকে পরহেয করা চাই। অমুসলিমদের সাথে এক দস্তার খানায়ও খাওয়া যায় তবে তা কখনও বন্ধুত্ব মূলক নিমন্ত্রণ না হওয়া চাই। কেননা অমুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম। উল্লেখ্য যে, মুরতাদের সাথে কোন অবস্থায়ই এক দস্তারখানায় খাওয়া জায়িয নয়।

✪ মোঃ গোলাম সাকলায়েন,
গ্রামঃ দৌলত দেয়াড় সরদার পাড়া,
চুয়াডাঙ্গা।

প্রশ্নঃ *(ক) একজন আলেম ব্যক্তি বল্লেন, কবর জিয়ারত করা বেদায়াত; আমাদের দেশে যে মিলাদ প্রচলিত আছে তাও নাকি বেদায়াত। তাঁর কথা কি ঠিক? সঠিক তথ্য জানালে উপকৃত হব।*

(খ) জামাতে নামায পড়ার সময় মুক্তাদিগন তাকবীরে তাহরীমা বেধে ছানা পড়বে। তার পর নিরবে দাড়িয়ে থাকবে। কিন্তু যদি কোন মুক্তাদি ছানার পর নিরব না থেকে আউযুবিল্লাহ্ বিসমিল্লাহ্ পড়ে ফেলে তাতে নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ, কবর জিয়ারত করা বিদয়াত নয় সুন্নাত। আর প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহ বিদয়াত।

(খ) মুক্তাদির ছানার পর নিরবে দাড়িয়ে না থেকে আউযু-বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া মাকরূহ তানজিহী। এতে নামাযের ক্ষতি হয় না।

✪ মোঃ ইয়াকুব খান,
পোঃ রামকৃষ্ণপুর,
হরিরামপুর,
মানিকগঞ্জ, ঢাকা।

প্রশ্নঃ *(ক) কোন হিন্দু মহিলাকে ইসলামে দিক্ষীত করে বিবাহ করার পর তার সাথে বারবার দেখা সাক্ষাৎ করা জায়েয আছে?*

(খ) নামাযের প্রত্যেক রাকাতে বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পড়তে হয়। কেউ যদি 'রাবুল মাশরি কাইনি ওয়া রাবুল মাগরিবাইন ফাবি আইয়্যে আলা-ই রাব্বিকুমা তুকাযিযবান' এতটুকু পড়ে তাতে নামায হবে?

(গ) ইসলামিক গানের সাথে বাজনা যোগ করা জায়েয আছে কি?

উত্তরঃ (ক) বিবাহের পরও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পর্দার ব্যবধান বর্তমান থাকে বলে আপনি মনে করেন কি? বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবল ঘন ঘন সাক্ষাৎই নয় বরং তাদের উভয়কে সব সময়ের জন্য এক সাথেই থাকা উচিত। এতেই জীবন সুখের ও সুন্দর হয়।

(খ) হাঁ এতে নামায হয়ে যাবে। এতটুকু কেরাতই যথেষ্ট।

(গ) বাজনাসহ গান পরিবেশন করা হয় বলেই মুলত গান হারাম। তাই যে কোন সংগীত বাজনাসহ পরিবেশিত হবে তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সে সংগীতের বিষয় যতই ভালো হোক না কেন- ইসলামের দৃষ্টিতে তার বিষয় নির্দোষ হলেও।

✪ সামছুল আহমাদ,
দেওরাইল সিনিয়ার মাদ্রাসা,
বদরপুর, করিমগঞ্জ,
আসাম,
ভারত।

প্রশ্নঃ *বাংলাদেশের বিগত সংসদ নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনে বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্য জোট কোন মহিলা প্রার্থী দিয়েছিলো কি? আগামী সংসদ নির্বাচনে এই জোট নির্বাচনে লড়বে কি?*

উত্তরঃ না, গত সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ঐক্য জোট সংরক্ষিত মহিলা আসনে কোন প্রার্থী দেয়নি। আগামী নির্বাচনে এরা লড়বে কিনা তা জোটের সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দই বলতে পারবেন। সংসদ নির্বাচনের এখনও অনেক বাকী। এ ব্যাপারে এখানে কোন গুঞ্জন নেই। মধ্যবর্তী কোন নির্বাচনের সম্ভানা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। তবে ওপারের আপনারা এ ব্যাপারে আগাম কোন সংবাদ বা সংকেত পেয়ে থাকলে জানাতে পারেন। আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখব যে, এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে কি না!

✪ মোঃ শরিফুল ইসলাম (শরীফ)

প্রশ্নঃ *(ক) শরীয়াত মতে তারাবিহ নামায পড়ায়ে টাকা নেওয়া বৈধ কি?*

(খ) চারজন পুরুষ একটি মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে কি?

উত্তরঃ (ক) বিজ্ঞ মুফতীগণের মতে চুক্তি ভিত্তিক তারাবিহ নামায পড়ায়ে টাকা নেয়া না জায়িয। টাকার বদলায় এই ধরণের ইবাদত খাটা জায়িয নয়। অন্তঃত এই ধরণের ইবাদত মূল্যে বিকায় না।

(খ) চারজন নয় দশজন পুরুষও একজন মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে। তবে এক সাথে নয় পর্যায়ক্রমে প্রথম স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্তা হলে বা তার মৃত্যু ঘটলে সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে, দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্ত হলে বা তার মৃত্যু ঘটলে সে তৃতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। বা অন্য কোন পুরুষ তাকে বিবাহ করতে পারবে। এভাবে যতবার এরূপ দুর্ঘনা ঘটবে ততবার সে নির্দিষ্ট সময়ের বিরতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

✪ মোছাম্মাৎ আবেদা খাতুন
গ্রাম ও পোঃ গওহরডাঙ্গা,
টুঙ্গিপাড়া,
গোপালগঞ্জ।

প্রশ্নঃ *(ক) মহিলাদের জন্য ছতর কতটুকু, কাদের সামনে ছতর ঢেকে রাখা ফরজ এবং কতক্ষণ পর্যন্ত ছতর ঢেকে রাখতে হবে?*

(খ) যে পোষাকে ছতর ঢাকে না এবং ঢাকলেও গায়ে থাকে না এমন পোষাক মুসলিম মহিলাদের জন্য পরিধান করা জায়িয কি?

উত্তরঃ গায়রে মুহরিমের বেলায় মহিলাদের সর্বশরীর ছতর। স্বামী বাদে মুহরিমের বেলায় মুখাবয়ব, হাতের কব্জি ও পাতাসহ টাখনু গিড়া পর্যন্ত ছতর। স্বামীর বেলায় স্ত্রী পর্দার বালাই থেকে মুক্ত।

(খ) সাধারণত মহিলাদের সর্বাবস্থায় এমন কাপড় বা পোষাক পরা উচিত যাতে তাদের চেহারা, হাতের কব্জি ও পায়ের পাতা উপরি অংশ বাদে সর্ব শরীর আবৃত থাকে। পরিধেয় কাপড় এর চেয়ে বেশী মসৃণ না হওয়া চাই যাতে শরীরের রং আন্দাজ করা যায়। আর এতটা আট-ঘাট না হওয়া চাই যাতে বিশেষ অংগের উঁচু নিচুতা চোখে পড়ে। যে কাপড়, চাঁদর বা দোপাট্টা গায়ে থাকে না তা মহিলাদের জন্য ব্যবহারের উপযোগী নয়। তাই ছতর তরক করা যেমন হারাম তেমনি যে কাপড়ে ছতর ঢাকে না তা বা কাপড় পরিধানের স্বার্থকাত লাভ হয় না তা ব্যবহার করাও হারাম।

✪ মোসাঃ তহমিনা মাহবুব,
সত্যপুর,মাগুরা,

প্রশ্নঃ আমরা প্রায়ই পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে শুনতে পাই যে, কাশ্মীর ও বসনিয়ার মুসলিম মা বোনদের ওপর অনবরত ধর্ষণ ও নির্যাতন চালাচ্ছে কাশ্মীর ও সার্বীয়ান বর্বর বাহিনী। এ অবস্থায় তাদের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি?

উত্তরঃ মুসলমান মাত্রই ভাই ভাই। এক মুসলমানের বিপদে অন্য মুসলমানের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া ঈমানের দাবী। এজন্য রাষ্ট্রীয় ভাবে কোন মুসলিম দেশ যদি অন্য কোন অমুসলিম রাষ্ট্র কতৃক আক্রান্ত হয় এবং মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালানো হয় তবে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব একযোগে আগ্রাসী রাষ্ট্রকে প্রতিহত করা। একজন মুসলমানও যদি বিধর্মীদের হাতে বন্দী থাকে

তবে তাকে উদ্ধারের জন্য সকলকে এগিয়ে যাওয়া ইসলামেরই কথা। আর এই দায়িত্ব পালন করার জন্যই মুসলমানদের জন্য জিহাদ একটি ফরজ ইবাদত বলে ঘোষিত হয়েছে। সুতরাং বসনীয়া ও কাশ্মীরে যে হারে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে তাতে প্রত্যেক মুসলমানের দীয়ত্ব বর্বরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা। একক বা ব্যক্তিগতভাবে এখানে কিছুই করার নেই। এটাই বাস্তবতা আর বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না।

✪ মোঃ ইউসুফ
উত্তর আবাসিক এলাকা,
চট্টগ্রামবিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশ্নঃ *আহমদিয়া কাদিয়ানী জামাত মুসলমান না কাফের? যদি কাফের হয় তাহলে তারা কেন কাফের তা জানতে চাই।*

উত্তরঃ আহমাদিয়া কাদিয়ানী জামাত বিশ্বের প্রখ্যাত সকল আলেমগণের দৃষ্টিতে অমুসলিম-কাফের। বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রখ্যাত আলেমগণের মিলিত বোর্ড কাদিয়ানীদের অমুসলিম বলে মতামত প্রদান করায় সৌদী আরব, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের অমুসলিম ঘোষণা করেছে। এছাড়া বিশ্ব মুসলিমের সর্বোচ্চ ধর্মীয় সংস্থা ওআইসিও সর্বসম্মাতভাবে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কাদিয়ানীরা অমুসলিম এবং কাফের হওয়ার অন্যতম প্রধান কালনগুলি হলঃ কাদিয়ানী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ও মিথ্যা নবীর দাবীদার মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার লেখা বিভিন্ন বই পুস্তকে নিজেকে আল্লাহ্, আবার কোথাও নিজেকে মরিয়ম (আঃ)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী ঈসা (আঃ) দাবী করেছেন। মির্জা কাদিয়ানী আরও দাবী করেছেন যে, অহির দরজা বন্দ হয়ে যায়নি, আল্লাহ্ তাকে তাঁর আপন রাসূল হিসেবে কাদিয়ানে প্রেরণ করেছেন। তার ধারণা মতে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কয়েকটি ইলহাম বোধগম্য নয়, তাঁর থেকে কয়েকটি ভুলও নাকি প্রকাশিত হয়েছে। মুহাম্মাদ (সাঃ) পরিপূর্ণভাবে ধর্ম প্রচার করতে পারেনি, তিনি সে কাজ পূর্ণ করতে রূপকভাবে মুহাম্মদ ও আহমাদ হিসাবে পুনরায় দুনিয়ায় আমন করেছেন। তিনি নিজেকে সকল নবীর সমকক্ষ বলেও দাবী করেছেন। গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর এসব দাবী ইসলামের আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী এবং সাংঘর্ষিক। তাই এরা ইসলাম থেকে খারিজ এবংঅমুসলিম বলে বিবেচিত। আপনি বিস্তারিত জানার জন্য 'জাগো মুজাহিদ' ১৯৯২ এর ডিসেম্বর সংখ্যা দেখুন।

✪ মোঃ মতিউর রহমান
গওহর ডাঙ্গা মাদ্রাসা,
টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

প্রশ্নঃ *শিয়া সম্প্রদায় কাকে বলে এবং তাদের আকীদা-বিশ্বাস কি?*

উত্তরঃ শিয়ারা একটা ভ্রান্ত ওগোমরাহ সম্প্রদায়। এরা ইসলামের কতগুলি মৌলিক বিশ্বাস নিয়ে চরম গোমরাহী প্রকাশ করে থাকে যা ইসলামের মুল বুনিয়াদের ওপর হস্তক্ষেপের সমান। শিয়া সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দল-উপদলের প্রধান 'ইছনা-আশারীয়া' সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, 'নবুয়াত প্রাপ্তির যোগ্য ছিলেন হযরত আলী (রাঃ), কিন্তু জিব্রাইল (আঃ) ভুল করে নবুয়াত হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট পৌছান। শিয়াদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বারজন ইমাম আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করেছেন বলে তাদের বিশ্বাস। প্রথম ইমাম ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)। পরবর্তিতে তাঁর বংশ থেকে আরও ১১ জন ইমাম আবির্ভূত হয়েছে এবং শেষ ইমাম (ইমাম মাহদী) এখনও আত্মপ্রকাশ করেননি। তাদের মতে এই ইমামতের ওপর বিশ্বাস রাখা ফরজ। তাঁরাও নবী রসূলগণের ন্যায় নিস্পাপ এবং যে কোন বিষয়ে হালাল হারাম সিদ্ধান্তগ্রহণ করার ক্ষমতার অধিকারী। তারা দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক, যাকে খুশী শাস্তি দেন ও যাকে খুশী ক্ষমা করেন। সৃষ্টি জগতের প্রতিটি কণার ওপর তাদের আধিপত্য। এই সম্প্রদায় প্রথম তিনজন খলিফাকে স্বীকার করেন না এবং তাদের কাফির ও প্রতারক বলে মনে করে। তারা বর্তমান পবিত্র কুরআন শরীফকে নকল কুরআন শরীফ বলে মনে করে। এ ধরণের আরও বহু আকীদা-বিশ্বাস তাদের মধ্যে প্রচলিত থাকায় একমাত্র 'জায়দী' ফের্কা ছাড়া আর সকল শিয়া ফেরকাকে বিজ্ঞ আলেমগণ অমুসলিম, কাফের বলে মনে করেন।

✪ মোঃ আঃ রাজ্জাক,
গ্রামঃ ফুলবাড়ী,
পোঃ গোবিন্দগঞ্জ,
গাইবান্ধা।

প্রশ্নঃ *উত্তর পাড়া দক্ষিণ পাড়া মিলে উত্তর পাড়ায় অবস্থিত জামে মসজিদে আমরা জুমার নামায পড়ি। আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব এক বছর আগেও ফরজ নামায বাদ হাত তুলে মুনাজাত করতেন। কিন্তু এখন আর মুনাজাত করেন না। এ নিয়ে উত্তর পাড়া ও দক্ষিণ পাড়ার জনগণের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে। এখন পৃথক ভাবে আর একটি মসজিদ তৈরীর পরিকল্পনা ও চেষ্টা চলছে। তাই সনির্বন্ধ অনুরোধ, কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণ্য দলীলসহ এর জবাব দান করলে আমরা গ্রামবাসী সকলে উপকৃত হব।*

উত্তরঃ নামাজ বাদ মুনাজাত করা নামাযের অংশ নয়। এটা নামাযের বাইরের ব্যাপার। এর সাথে নামাযের এতটুকু সম্পর্কও নেই। এ ব্যাপারে পরিস্কার ধারণার অভাবই এই সব দ্বন্দ্বের মুল কারণ বলে মনে করি। এই দেশের অধিকাংশ মুসলমানই এই ভুলের শিকার। এ ব্যাপারে আপনাদের ইমাম সাহেবের দ্বন্দ্বে জড়ানো ঠিক হয়নি। তার উচিত ছিল বিষয়টি সম্পর্কে মুসল্লীদেরকে পরিস্কার

ধারণা দেওয়া। এতে তিনি ব্যার্থ হলেও দ্বন্দের পথ এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হত। মুসল্লীদের মধ্যে এইরূপ একটি সাধারণ বিষয় নিয়ে বিরোধ বা ফাসাদ সৃষ্টির ফলে যতটুকু লোকসমান হবে মুনাজাতের পক্ষে বিপক্ষে ময়বুত থাকলে তা পোশাবে কি? কেননা মুনাজাত করে বা না করে আমরা যতটুকু উপকৃত হব তার চেয়ে বহুগুণ বেশী ক্ষতি ও অনিষ্টের সম্মুখীন হব এমন একটা সাধারণ বিষয় নিয়ে ফাসাদে জড়ালে--মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরে ঘৃণা ও অনৈক্যর সৃষ্টি হলে। তাই বৃহৎ স্বার্থে ক্ষুদ্র বিরোধ পরিহার করাই বাঞ্চনীয়। এতে ভবিষ্যতে সকলকে বিষয়টা বুঝবার সুযোগ থাকবে। নতুবা যারা বিপক্ষীয় দলে অবস্থান নিবে তারা এটাকে সামাজিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে উত্তর উত্তর বিরোধের হাওয়া আরও গরম করতে থাকবে। তাই ইসলাম ও শরীয়াত সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এই দেশের সরল মনা মুসলমানদের সত্য উপলব্ধির সুযোগ থেকে দূরে রেখে সমাজ সংস্কারের চিন্তা করা যা কি? তাই ইমাম-মুসল্লি সকলে দ্বীন ও ইত্তেহাদের স্বার্থে আরও সহনশীল ও আন্তরিক হবেন বলে আশা রাখি। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করুন।

✪ মোঃ কাছার রাব্বী,
সাদ্রাসা এমদাদিয়া দারুল উলুম,
১২-ডি, মিরপুর,
ঢাকা-১২২১।

প্রশ্নঃ *প্রচলিত জারী গানের ক্যাসেটে শুনা যায় যে, হুযুর (সাঃ) একদিন উপস্থিত সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "বেলাল (রাঃ) অমুক দিন রাত ১২ টার সময় মৃত্যুবরণ করবে।" অথচ বেলাল (রাঃ) তখনও বিবাহ করেন নি। তাই তরি ঘড়ি করে শেষ পর্যন্ত দ্রুত ঘনিয়ে আসা মৃত্যুর তারিখে তার বিবাহ হয়। প্রিয়তমা স্ত্রী মৃত্যুর দিন প্রাণ প্রিয় স্বামীর জন্য কিছু রুটি তৈরী করে কয়টি স্বামীকে খেতে দেন আর বাকীগুলো রেখে দেন স্বামী যদি পরে ক্ষুধার কথা বলেন এজন্য।*

এমন সময় এক ফকির এসে দরজায় উপস্থিত। স্ত্রী তার স্বামীর জন্য রাখা রুটিগুলো এনে ফকীরের হাতে তুলে দেয়। ফকির তার মলিন মুখ দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে তাকে বলে যে, আজ রাত বারটার সময় প্রথম বাসরে তার স্বামী ইন্তেকার করবে। এই মর্মন্তুত সংবাদ শুনে সে স্তম্ভিত হয় এবং রুটিগুলো নিয়ে দরজার ওপর বসে থাকে। ফকীর আজরাঈল (আঃ) এর আগমনের অপেক্ষা করছে। ঠিক রাত বারটার সময় বেলালের (রাঃ) ঘরের দরজার আজরাইল (আঃ)-এর সাথে ফকীরের সাক্ষাৎ। ফকীর তাঁকে বুঝায় যে, কি ভাবে একটি লোকের বাসর রাতে আপনি জান কবয করবেন? একটুও দয়া নেই আপনার? ইত্যাদি কথা বলে বুঝিয়ে ফকীর আজরাঈল (আঃ)কে ফিরে যেত বাধ্য করে। আজরাঈল (আঃ) ফিরে গিয়ে এই ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলাকে জানালে তিনি ফকীরের অনুরোধে ১দিন করে ৭ দিন এবং দয়ার আতিসয্যে এসে ৭-এর পিঠে শূন্য দিয়ে ৭০ বছর তার আয়ু বৃদ্ধি করে দেন।"

এই তথ্য কতটুকু সত্য তা জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তরঃ এই তথ্যের সর্বাংশ বানানো ও অসত্য। সীরাত ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এর পক্ষে কোন প্রমান নেই। নবী ও সাহাবী তো বহু ওপরের কথা সাধারণ লোকের ব্যাপারেও বানিয়ে কথা বলা কোন ছোট অপরাধ নয়। জঘন্য অপরাধ। অতএব এসব মিথ্যায় ভরা ক্যাসেটগুলো সরকারের বাজেয়াপ্ত করা উচিত। আমাদের উচিত এসব ক্যাসেট শুনা থেকে বিরত থাকা

✪ মিসেস মোহসেনা,
গ্রামঃ চৌয়ারা,
পোঃ চৌয়ারা বাজার, কুমিল্লা সদর।

প্রশ্নঃ *আলিমদের নিকট শুনেছি, জন্ম নিয়ন্ত্রণ জায়িয নয়। কিন্তু আমাদের গ্রামের এক মহিলা আট সন্তানের মা হওয়ার পরেও লাইগেশন অপারেশন করে গর্ভাশয়ের মুখ বন্ধ করে নিয়েছে। তবে সে দ্বিতীয়বার অপরাশেরন করে গর্ভাশয়ের মুখ খুলে গর্ভধারণ করতেও সক্ষম হবে। এই পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়িয কি? আর যদি জায়িয না হয় তাহলে এতে কিরূপ পাপ হবে এবং এই পাপ থেকে মুক্তির উপায়কি?*

উত্তরঃ স্থায়ী কালের জন্য লাইগেশন করা তো জায়িয নয়ই অস্থায়ী সময়ের জন্যও জায়িয নয়। আসলে খাদ্যাভাবের চিন্তা করে জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতি গ্রহণই জায়িয নয়। এ সব স্পষ্ট হারাম। এই সব পন্থা ও পদ্ধতি পরিহার করে আল্লাহ্র কাছে তওবা করা ছাড়া মুক্তি ও মাফ পাওয়ার কোন পথ নেই।

✪ হাফেজ আবু তৈয়ব ইবনে সিরাজ,
মাদ্রাসায়ে হামিউসসুন্নাহ,
মেখল, হাটহাজারী,
চট্টগ্রাম

প্রশ্নঃ *জিহাদে আকবর ও জিহাদে আসগার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চাই। অনেকে নফসের সাথে জিহাদ করাকে জিহাদে আকবর আখ্যায়িত করে ময়দানে ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলায় জীবন বাজি রেখে জিহাদ করাকে জিহাদে আসগার বলে বিদ্রুপ করে। বিষয়টি কি আসলেইতাই?*

উত্তরঃ আল্লাহ্র পথে বীরের মত শাহাদাত বরণ করার চেয়ে ভীরু জীবনকে যারা পছন্দ করে এসব কথা তারাই বলে। পবিত্র কুরআনে নামায সম্বন্ধে যত আলোচনা করা হয়েছে তার চেয়ে বহু

(১৮ পৃঃ দেখুন)

পরিচালকের চিঠি

আস্‌সালামু আলাইকুম

প্রিয় নবীন বন্ধুরা। আশা করি তোমরা সকলে সুস্থ্য ও সুখে আছো। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার মত ব্যতিক্রমী জীবন যাপনের পর আবার ফিরে এসেছো স্বাভাবিক জীবনের উন্মুক্ত বাতায়নে। এই উন্মুক্ত বাতায়নের প্রতিটি পদক্ষেপে যেন রমযানের আদর্শ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলেই বিগত দীর্ঘ একমাসের কঠিন ও অক্লান্ত সাধনা সার্থক হবে। এ কথা ভুল্লে চলবে না। একটি মুহূর্তের জন্যও ভোলা যাবে না রমযানের শিক্ষার কথা। এত কষ্টের ফসল মাঠে ফেলে আসা কি বুদ্ধিমানের কাজ?

তোমাদের অনেকের শুরু হয়েছে নতুন শিক্ষা বছর। এই বছর যেন বিগত বছরের চেয়ে লেখা–পড়ায় তোমরা আরও মনোযোগী হও এই কামনায়।

মাআস্‌সালাম

আপনার চিঠির জবাব

• মোঃ নাজমুল করীম,
বখতার মুন্সী সিনিয়ার মাদ্রাসা,
সোনাগাজী, ফেণী।

ডাকটিকিট সংগ্রহ করা আপনার সখ। আর সাধ হলো মুজাহিদদের হাতে আফগান বিজয়ের পূর্বের ও বর্তমানের ডাক টিকেট সংগ্রহ করা। এ ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা কামনা করেছেন। এজন্য আপনাকে সরাসরি আমাদের ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি। ভাগ্যে থাকলে পেতেও পারেন। কেননা আপনার মত অনেকেই বহু পূর্ব থেকে এখান থেকে টিকেট নিয়ে এরাম সজ্জিত করছে। অতএব এতদূর থেকে আপনাকে এ ব্যাপারে কতটুকু সহযোগিতা করতে পারব তাই ভাবছি।

• মোঃ হুমায়ুন কবীর,
গ্রামঃ হেলেঞ্চা,
ডাকঃ ভাদুরিয়া,
নবাবগঞ্জ,দিনাজপুর।

আপনি নিয়মিত পত্রিকা ও সাহিত্য পাঠ করুন এবং লিখুন। আপনার লেখাগুলো আপনার নিকটের কোন ভালো লেখক সাহিত্যিককে দেখান এবং তার সাথে যোগাযোগ রাখুন— যদি লেখক হতে চান। সব ভালো পত্রিকায় লেখা ছাপা হওয়ার আত্মবিশ্বাস থাকা চাই। আর আপনার কবিতাটি ছাপার উপযোগী হলে কোন এক সংখ্যায় তা অবশ্যই ছাপা হবে। বাংলাদেশ কবির দেশ তো তাই জমা কবিতার সংখ্যা সহস্র ছাড়িয়ে যাবে। অতএব অপেক্ষা করুন এবং আরও লিখুন।

• গাজী শাহ জাহান চিশ্‌তী,
প্রযত্নেঃ মদীনা বার্তা সংস্থা,
কালাউক,
হবিগঞ্জ–৩৩৪০।

ফেব্রুয়ারী ৯৩ইং সংখ্যায় প্রকাশিত 'মাহে শাবান ও শবে বরাতের ফজিলত' শীর্ষক লেখাটি ভালো লাগায় প্রতি আরবী মাসের ফজিলত সম্পর্কে নিয়মিত লেখা প্রকাশ করার পরামর্শ দিয়েছেন। আপনার পরামর্শটি অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার দাবী রাখে। এ জন্য বাস্তব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারলে এই বিষয়ের ওপর নিয়মিত পাতা চালু করার ইচ্ছা আছে।

• এইচ, এম রিজওয়ানুল বারী
গহিরা আলিয়া মাদ্রসা,
গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

আপনার আসংকা ও আকাংখা বাস্তব, আমাদের ঠিকানায় যোগাযোগ রাখুন, নিয়মিত পত্রিকা পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে দিন। এই পত্রিকা আপনাকে যেমন সত্যের পথে জীবন দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে অনুরূপ আপনার মত বহু উদ্যমী যুবক আছে যাদের হাতেও এই পত্রিকা তুলে দিন। তাদেরকে নিয়ে আপনি আপনার এলাকায় বাতিলের মোকাবিলায় এক সুদৃঢ় প্রাচীর গড়ে তুলুন। আল্লাহ্ আপনার সত্য জ্ঞানের তৃষ্ণা ও অনুপ্রেরণা আরও বাড়িয়ে দিন। দুআ' করি, আপনি পরীক্ষায় ভালো ফল করে আব্বা–আম্মার মুখ উজ্জল করতে সক্ষম হন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বীনের বন্ধুর পথে মযবুত থাকার তাওফীক দান করুন।

• মোঃ আঃ ওয়াদুদ খান (রেনু)
সাংঃ দঃ ভাদিকারা,
থানাঃ কালাউক, হবিগঞ্জ।

না তারা কোন বেতন–ভাতাদি পান না। আপনি সময় সুযোগ মত আমাদের ঠিকানায় যোগাযোগ করে সব তথ্য জেনে নিন। আপনি নবীন মুজাহিদদের সদস্য না হলেও 'বলতে পারো?–এর উত্তর পাঠাতে পারবেন–যদি আপনার বয়স ১৮ বছরের কম হয়।

• আঃ মান্নান রওশনী
আরবী বিশ্ববিদ্যালয়,
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

আল্লাহ্ আপনাকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন। আপনার মূল্যবান চিঠিটির জন্য ধন্যবাদ।

• হাঃ মোঃ ওয়ালী উল্লাহ্ (মুরাদ)
দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম
গাওহর ডাংগা মাদ্রাসা,
টুংগিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

ইসলামের বিজয়ের পূর্বে 'মুলকে হাবশা' বা বর্তমান ইরিত্রিয়ার রাষ্ট্র প্রধানকে নাজ্জাশী উপাধিতে অবিহিত করা হত। 'নাজ্জাশী' উচ্চারণই পরিচিত ও প্রচলিত। যে কোন নামের বেলায় অর্থগত বিকৃতি ও আকিদাগত জটিলতা দেখা না দিলে প্রচলিত উচ্চারণটি গ্রহণ করাই শ্রেয়, নতুবা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। রাসূল (সাঃ)–এর সময়কার নাজ্জাশীর নাম ছিল 'আসমায়াহ'। এই কথাগুলো আপনার মনে রাখা একান্ত দরকার।

• কবি মোল্লা ফজলুর রহমান (কাব্যরত্ন),
সাউথ সার্কুলার রোড,
দক্ষিণ টুটপাড়া, খুলনা।

অর্থাভাবে আপনি কবিতা ছাপাতে না পারার জন্য দুঃখ আপনা নয় দুর্ভাগ্য এই জাতির। আপনার ভালো বিষয়ের সুন্দর কবিতাগুলো আজই আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। আপনার কাব্যের উৎকর্ষ ও প্রতিভা বিকাশে সামান্য সহযোগিতা করার সুযোগ পেলে নিজেদেরকে ধন্য মনে করব। এই সুযোগটুকু আমাদেরকে দান করে বাধিতকরুন।

বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের তৎপরতা

কাশ্মীর রণাঙ্গনে হরকত কমাণ্ডারের শাহাদাত বরণ

কাশ্মীরে হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর একজন বিশিষ্ট কমাণ্ডার চৌধুরী গিয়াসুদ্দিন শহীদ হয়েছেন। তিনি কাশ্মীরের খানপুরে সৈন্যদের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। কয়েক ঘন্টা ব্যাপী এ লড়াইয়ে ভারতীয় বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। নিহত হয় কয়েক ডজন সৈন্য। যুদ্ধ শেষে নিহত সেনাদের লাশ ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যেতে দেখা গেছে। শহীদ চৌধুরী গিয়াসুদ্দিন হরকতের একজন পুরানো মুজাহিদ। তিনি গত নভেম্বর মাসে হরকাতের অন্যতম কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ লেংরিয়ালের সাথে সহকারী হিসেবে কাশ্মীরে প্রবেশ করেন এবং উল্লেখিত যুদ্ধে তিনি কমান্ডারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। উল্লেখ্য, কমাণ্ডার নসরুল্লাহ্ লেংরিয়াল ইতিমধ্যে বারমুলা, কুপওয়াড়া ও ইসলামাবাদে বেশ কয়েকটি সফল আক্রমণ পরিচালনা করেছেন। এসব হামলায় ভারতীয় বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। তিনি আফগান জিহাদে রাশিয়ান ও আফগান কম্যুনিষ্ট সৈন্যদের নিকট বিভীষিকা হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন।

অধিকৃত এলাকায় আরবদের ঢুকতে না দিলে অবস্থার অবনতি ঘটবে -হামাস

ইসরাইল সরকার সম্প্রতি আরব ফিলিস্তিনীদের হামলায় ৫জন ইজরাইলী বসতি স্থাপনকারী ইহুদী নিহত হলে ইসরাইল অধিকৃত আরব ভূখণ্ডে আরবদের প্রবেশ বন্ধ করে দিলে এবং আরবদের ছাটাই করে ইহুদীদের চাকুরীতে নিযুক্ত করার উদ্যোগ নিলে ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন 'হামাস' ইসরাইলী সরকারকে এ ব্যাপারে হুসিয়ার করে দিয়ে বলেঃ এ ধরণের উদ্যোগ নেয়া হলে আরব অধিকৃত এলাকা শান্ত নয় আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠবে।

মিসরের জামাআত আল-ইসলামিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে কাঁপিয়ে দিয়েছে

যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিচারক এক রায়ে নিউ ইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে বোমা হামলার ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে যুক্তরাষ্ট্রে স্বেচ্ছা নির্বাসন জীবন-যাপনরত মিসরের আল জামাআত আল-ইসলামিয়া আন্দোলনের নেতা শেখ ওমরকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছেন। শেখ ওমর নিউ ইয়র্কের জার্সি শহরের আল-সালাম মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি তার বিরুদ্ধে উথাপিত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বোমা হামলার সাথে সরাসরি জড়িত মোহাম্মদ সালামেহ ও নিদাল আয়াদের সম্পর্কে বলেন যে, এরা প্রায়ই আল-সালাম মসজিদে নামাজ পড়তো কিন্তু তাদের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

১৯৮১ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের হত্যাকাণ্ডের জন্য জামায়াত আল-ইসলামিয়াকে অভিযুক্ত করা হয়। সম্প্রতি জামায়াত আল-ইসলামিয়া আন্দোলন মিশরে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং মিশরের সেকুলার সরকারের রক্তচক্ষুর সম্মুখীন হচ্ছে। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী এই সংগঠনের সদস্যদের ওপর ব্যাপক ধর-পাকর ও দমন অভিযান চালাচ্ছে। আমেরিকার সরকারও এদের তৎপরতায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এবং এই আরব দেশটিতে ইসলাম পন্থীদের উত্থানকে সুনজরে দেখতে পারছেনা। তাই নিউ ইয়র্কের বোমা হামলার সাথে কৃত্রিম যোগসূত্র আবিষ্কার করে জামেয়ার এই নেতাকে সন্ত্রাসী প্রমাণ করে বিশ্বে তাঁর ভাবমূর্তিকে নস্যাৎ করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে আমেরিকার আধুনিক ফেরাউনী সরকার।

কাশ্মীরে একজন বিশিষ্ট মুসলিম চিকিৎসক নিহত

কাশ্মীরের বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আবদুল আহাদ ভারতীয় বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন। ৭ই এপ্রিল ডাঃ আহাদ শ্রীনগরের বারমুল্লায় নিজ বাসভবন থেকে অপহৃত হন। এর দুনিদ পর রাস্তায় তার গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়। ডাঃ আহাদ গুরু জে, কে, এল, এফ-এর একজন উর্ধতন সদস্য ছিলেন এবং ১৯৮৯ সালে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সুফতি সাঈদের অপহৃত কন্যা রুবাইয়া সাঈদের মুক্তির ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন। জনপ্রিয় এই ডাক্তারের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে একদিন পর গত শুক্রবার কাশ্মীর উপত্যকায় ধর্মঘট পালিত হয়। হোটেল-রেস্তোঁরা, অফিস-আদালত, হাসপাতাল সমূহ বন্ধ রাখা হয়। শ্রীনগরের রাস্তায় শোকার্ত মানুষের ঢল নামে। পুলিশ এই শোক মিছিলের ওপর গুলি ছুড়লে ঘটনাস্থলে ২ জন নিহত হয়। এর একজন নিহত ডাঃ গুরুর শ্যালক।

ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে মুজাহিদ ও সৈন্যদের মধ্যে দিনভর সংঘর্ষ চলে। সংঘর্ষে মুজাহিদ, ভারতীয় সৈন্য ও বেসামরিক লোক মিলিয়ে মোট ১৫ জন নিহত হয়। নিহতদের আলাদা সংখ্যা নির্ণয় করা যায়নি।

লিবিয়ার নেতা কাজ্জাফী বিশ্বকে চমকে দিয়েছেন

এবার লিবিয়ার লৌহ মানব মোয়াম্মার কাজ্জাফী (কাজ্জাফীই তার আসল নাম। ইংরেজী উচ্চারণে তাকে বিকৃত করে গাদ্দাফী বলা হয়) বিশ্বকে আবার চমকে দিয়েছেন। তিনি সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তার দেশে ইসলামী আইন কঠোর ভাবে প্রয়োগ করবেন, চৌর্য বৃত্তির জন্য

হাত কাটা এবং ব্যভিচারীদের প্রকাশ্যে বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা সম্বলিত নয়া বিধান জারী করবেন। সরকারী তহবিল চুরির জন্য সরকারী কর্মচারীদের অধিকতর কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। আমরা কাজ্জাফীর এই উপলব্ধিকে এবং তার অদম্য মনোবল, দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু একই সাথে আমাদের দুঃখ প্রকাশ করতে হচ্ছে যে, এমন একজন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা ও প্রতিভার সেবা থেকে ইসলাম ও মুসলমানরা বঞ্চিত হচ্ছে। উল্লেখ্য লিবিয়ার শাসন কাঠামো আংশিক ইসলাম ও আংশিক কমুনিজমের সমন্বয়ে প্রণীত। বিচার ব্যবস্থার কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়তকে অনুসরণ করা হলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কমুনিজমের প্রবল দাপট যা' ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি অবজ্ঞা ও অস্বীকার করার নামান্তর। লিবিয়ার এই নেতা সেনাবাহিনীতে যোগাদান করার পর থেকেই সমগ্র সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে আরবদের মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। এসময় আরব ইসরাইল যুদ্ধ, আরবদের প্রতি আমেরিকা বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালীর মোনাফেকী ও ন্যাক্কারজনক ভূমিকার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি তার মন ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে। ক্ষমতায় এসে তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। কিন্তু নিজের দেশের প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক সহায়তার জন্য ইসলামের আর এক দুশমন কম্যুনিষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারস্থ হন। ক্রমান্বয়ে সোভিয়েত সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের সাথে সাথে রুশদের সমাজতান্ত্রিক—অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও তার দেশে চালান হয়ে আসে এবং এক সময় কাজ্জাফী লিবিয়াকে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। মোয়াম্মার কাজ্জাফী যদি খাঁটি ইসলামের অনুসারী হতেন তবে তাকে তার দৃঢ়বেতা মনোবলের জন্য সারা মুসলিম বিশ্বে মহান নেতা শ্রদ্ধা করা হত।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম জাগরণ, খৃস্টানদের মনে মাঘের শীতের কাঁপন

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মুসলিম পূনঃর্জাগরণের ফলে খৃষ্টানরা এসব দেশ থেকে লোটা-কম্বল নিয়ে পালাচ্ছে। গীর্জা ও বিদেশী কনস্যুলার সূত্র থেকে জানা যায়, প্রতি বছর হাজার হাজার খৃষ্টান মিশর, সুদান, ইরাক, তুরস্ক, জর্ডান, ইসরাইল অধিকৃত আরব ভূ-খণ্ড ছেড়ে আমেরিকা, কানাডা ও পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ খৃষ্টান মধ্য প্রাচ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। এ মাসের প্রথম দিকে ভ্যাটিকান থেকে খৃষ্টান বহিরাগমনের এ হারকে অভিশাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের গীর্জা পরিষদের প্রধান গেবরিয়েল হাবিব বলেন, "দেশ ত্যাগের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে এবং এ অবস্থা চলতে থাকলে এক সময় মধ্য প্রাচ্যের গীর্জাগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বা ঘন্টা বাজানোর জন্যও কেউ অবশিষ্ট রইবে না।

বসনিয়ায় ইসলামী পুনর্জাগরণের ঢেউ বইছে

বসনিয়া-হার্জেগোবিনায় ইসলাম তার গোরবজনক ভূমিকায় ফিরে আসছে। বসনিয়ার মুসলমানরা আজ মুসলমান বলে গর্ভ করে। আর এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে ১ বছর ব্যাপী সার্ব-মুসলিম যুদ্ধ। বসনিয়ার মুসলমানরা যুদ্ধের পূর্বে নিজেদের মুসলমান পরিচয় দিতে লজ্জা পেত। তারা ইউরোপীয় চাল-চলনে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা মদ পান করত, শুধু বিবাহের জন্য মসজিদে যেত। একে অপরকে ইউরোপীয় কায়দায় 'হাই' বলে সম্বোধন করত। কিন্তু যুদ্ধ তাদের জীবনকে নতুন ভাবে পরিচালিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তারা এখন মদ পান ত্যাগ করেছে, আরবী কায়দায় 'মারহাবা' বলে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, মুয়াজ্জিন এখন উচ্চস্বরে মসজিদে আজান দেয়, মুসল্লিতে নামাজের সময় মসজিদ ভরপুর হয়ে যায়। দীর্ঘ দীন পর বসনিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় অনুশীলন ব্যাপক হারে শুরু হয়েছে। মুসলমানরা এখন বসনিয়াকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

আলজেরিয়ায় ১৮ জন সৈন্য মুজাহিদদের হামলায় পরপারে পাড়ি জমিয়েছে

আলজেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে কাসার আল বোসারীর কাছে এক সেনা ছাউনীতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে মুজাহিদরা ১৮ জন সৈন্যকে হত্যা করেছে। ছাউনীতে এসময় সেনারা খেতে বসেছিল। হামলায় একজন ডিউটি অফিসার, একজন নন-কমিশন রেডিও অফিসারসহ ৪ জন রক্ষীও ছোরার আঘাতে নিহত হয়।

আফগান মুজাহিদরা এবার কাশ্মীর অভিমুখে

ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলো কাশ্মীরে আফগান মুজাহিদদের উপস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। খবরে জানা গেছে যে, এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে সোপুর শহরে এক প্রচণ্ড বন্দুক যুদ্ধে একজন আফগান ও ২ জন কাশ্মীরী মুজাহিদ শহীদ হয়। এই যুদ্ধে একজন সৈন্যও নিহত হয়েছে।

মিশরের ধর্মীয় নেতাদের বক্তৃতার টেপ সর্বত্র চড়িয়ে পড়েছেঃ প্রশাসন আতঙ্কিত

ধর্মীয় নেতাদের বক্তৃতা ধারণকৃত অডিও ক্যাসেট এখন মিশরে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠনের ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। দেশের সর্বত্র গোপনে গোপনে এই ক্যাসেট ছড়িয়ে পড়েছে। একজন বিখ্যাত খতিব আহমদ আল মাহালবীর ভাষণের ধারণকৃত ক্যাসেট বিপুল পরিমাণে বিলি করা হচ্ছে। যাতে তিনি বলেছেন, "বহির্বিশ্বের চেয়ে আগে

দেশের অভ্যন্তরে আল্লাহ্‌র দুশমনদের পরাভূত করা মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য। আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও ধর্মের প্রতি কটূক্তি উচ্চারণকারীর জিহবাকে অচল করে দিতে হবে। ইসলামকে রক্ষা করতে হলে জিহাদের সময় তলোয়ারের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইসলামের ওপর যে মিথ্যা ও জঘন্য অপবাদ দেয়া হচ্ছে তাঁর মোকাবিলায় অবশ্যই পাল্টা বাকযুদ্ধের প্রয়োজন রয়েছে।"

খতীব মাহালবী প্রেসিডেন্ট সাদাতের সময় জেল খেটেছেন। তাঁর এবং হামিদ আল কিসককের ওপর ১৯৮১ সাল থেকে প্রকাশ্যে বক্তৃতা বিবৃতি দানের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বর্তমানে তাঁরা গোপন স্থান থেকে ক্যাসেটের মাধ্যমে বক্তৃতা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তবে জামায়াত আল-ইসলামিয়ার নেতা নিউ জার্সির আল সালাম মসজিদের অন্ধ খতিব শেখ ওমর আব্দুর রহমানের (৫৪) বক্তৃতা বিবৃতি খুবই আকর্ষণীয়। মিশরের ৬ কোটি লোকের প্রায় ২ লক্ষ মুসলমান আল জামাআত আল-ইসলামিয়ার সমর্থক। এদের ১০ হাজার সমর্থক মৃত্যুভয়হীন মুজাহিদ। এদের সাথে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে গত ১৫ মাসে ১৫০ জন প্রাণ হারিয়েছে, আহত হয়েছে ২৩০ জন।

এই অন্ধ খতীবের বক্তৃতা সম্প্রতি মিশরের মসজিদ গুলোর বাইরে পত্রাকারে বিলি করা হয়েছে। ফ্যাক্সের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমেও তা' পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। রমজানের শেষে বিলি করা সে পত্রে উল্লেখ ছিল, "তোমরা যে রকম শাস্তি ভোগ করছ, সে রকম শাস্তি মিশরের শাসকদের দাও। তারা যদি তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মনে রেখ, আল্লাহ্ তোমাদের সহায়।"

গত বছর মিশরে ইসলাম পন্থীদের দমন করার জন্য সন্ত্রাস দমন আইন পাশ করা হয়।

এই আইনের আওতায় ইসলাম বিষয়ক যে কোন বক্তৃতা বিবৃতির টেপ বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তবুও সেকুলার সরকারের মাথা চিন্তায় হাটুতে এসে ঠেকেছে। তারা ভালো করেই জানেন, দমন নির্যাতন চালিয়ে কখনো কোন ইসলামী আন্দোলনকে ধ্বংস করা যায় না বরং আঘাতের ফলে মুজাহিদদের ঈমানী চেতনা আরও মজবুত হয়, ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা, মৃত্যুভয়হীন চেতনা নিয়ে তারা লক্ষ্যের পানে এগিয়ে যাবেই। শহীদী রক্ত দেখে তারা দমে যায় না বরং শহীদের রক্ত মুজাহিদদের কাফেলার চলার গতি আরও বেগবান করে। এছাড়া নিষেধাজ্ঞা জারী করে যে তারা ক্যাসেট বিক্রি বন্ধ করতে পারবে না তার জলন্ত প্রমাণ ইরান। ইরানের শাহ শত কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর বক্তৃতার টেপ ইরানে প্রবেশ বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। আর এর ফলেই শাহের পতন তরান্বিত হয়েছিল।

আর্মেনিয়ান বাহিনীর ট্যাংকের তলায় ৬০ জন আজারী মুসলমানের নির্মম মৃত্যু

সম্প্রতি আর্মেনিয়া আজারবাইজানের কেলবাজহার নগরী দখল করে নেয়ার পর সেখান থেকে ৬০ জন আজারী মুসলমান দুটি ট্রাকে করে পালানোর পথে আর্মেনিয়ান বাহিনী তাদের পথরোধ করে এবং প্রতিটি লোককে ট্যাঙ্কের নিচে পিষে মারে। পরে ট্যাঙ্কের গোলা বর্ষণ করে ট্রাক দুটিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। পাঁচ বছর ধরে নাগারনো-কারাবাখ ছিটমহলটি নিয়ে দেশ দুটির মধ্যে যুদ্ধচলছে।

কাশ্মীরে প্রচণ্ড ভারত বিরোধী বিক্ষোভঃ শহীদের রক্তে লালে লাল শ্রীনগরের রাজপথ

কাশ্মীরের পাহাড়গুলোর বরফ গলতে শুরু করেছে। তাই মুজাহিদদের আগ্নেয়াস্ত্র গুলিও ভারতীয় সেনাদের বুকে রক্তের আলপনা একেদিয়ে নববর্ষের স্বাগতম-শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করে দিয়েছে। এরই প্রতিফলন ঘটল ১১ই এপ্রিল শ্রীনগরের কেন্দ্রস্থল রেড স্কোয়ারে আযাদী পাগল কাশ্মীরের মুসলমানদের প্রচণ্ড বিক্ষেভে ফেটে পড়ার ঘটনায়। প্রায় দেড় হাজার নারী ও পুরুষ "আমরা স্বাধীনতা চাই", "ভারত সরকারের পতন হোক", ইত্যাদি শ্লোগানে ফেটে পড়ে। এর পূর্বের দিন একই স্থানে কাশ্মীরী মুজাহিদ ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে এক প্রচণ্ড বন্দুক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে ভারতীয় সেনারা দোকান-পাটে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে দেড় শত বাড়ী দুইশত দোকানপাট, ছয়টি হোটেল ভস্মীভূত হয়। এলাকায় দু' পক্ষের গুলি বিনিময়ের ফলে এবং অগ্নিকাণ্ডের ফলে লোকজন আটকা পড়ে যায় এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে অর্ধ শতাধিক নিহত হয়। তাড়াহড়া করে নৌকায় করে খরস্রোতা ঝিলাম নদী পার হওয়ার সময় ১৮ জন মুসলমান নৌকা উল্টে ডুবে মারা যায়। উক্ত সংঘর্ষে ৫ জন সৈন্যও নিহত হয়। পরের দিন এ ঘটনার প্রতিবাদে কাশ্মীরীরা প্রতিবাদ বিক্ষেভ জানালে নিরাপত্তা বাহিনী মিছিলের ওপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে এতে ৩৮ জন ঘটনাস্থলে শহীদ হয়। কাশ্মীরে গ্রীষ্ম মওসুম শুরু হওয়ায় বরফ গলতে শুরু করায় মুজাহিদদের পক্ষে অভিযান পরিচালনা সহজতর হচ্ছে। এরই ফলে কাশ্মীরে এখন সংঘর্ষ নিত্য দিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। উক্ত ঘটনার ২ দিন পূর্বে শ্রীনগরের পাশ্ববর্তী একটি এলাকায় মুজাহিদদের পেতে রাখা একটি ল্যাণ্ড মাইনের আঘাতে বি,এস,এফ এর একটি গাড়ী বিধ্বস্থ হলে তাতে ৪ জন বি,এস,এফ সৈন্য নিহত হয় এবং গুরুতর আহত হয় আরও ৩ জন।

গ্রন্থনায়ঃ ফারুক হোসাইন খান

RG. DA. NO. 1101- MONTHLY JAGO MUJAHID - ■ MAY 1993 ■ - PRICE TK-7

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সূতী, স্যানডাক্স,
নায়লন ও টারকিস মোজা প্রস্তুতকারক

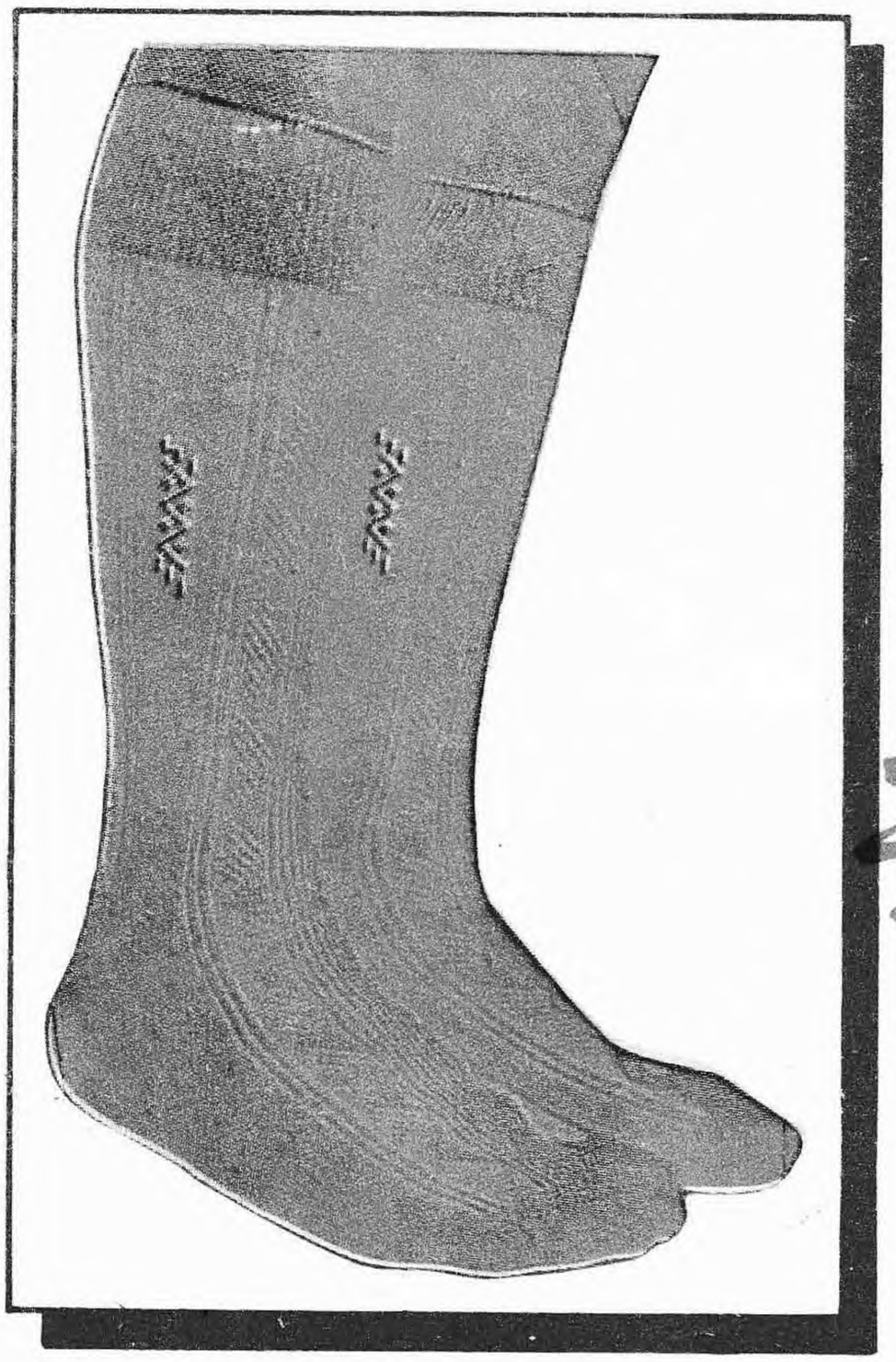

Chand SOCKS

চান্দ হোসিয়ারী মিলস

৩০, শাখারী নগর লেন, ফরিদাবাদ, ঢাকা–১২০৪

হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ–এর পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও তিতাস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ
২৩ যদুনাথ বসাক লেন (টিপু সুলতান রোড), ঢাকা হতে মুদ্রিত।